তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्

सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया

पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

চতুর্দ্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

১৮১৯ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৪। কলিগতাব্দ ৪৯৯৮। ৩ চৈত্র বুধবার।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চতুর্দ্দশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র

বৈশাখ ৬৪৫ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ ৬৪৬ সংখ্যা।

আষাঢ় ৬৪৭ সংখ্যা।

শ্রাবণ ৬৪৮ সংখ্যা।

ভাদ্র ৬৪৯ সংখ্যা।

আশ্বিন ৬৫০ সংখ্যা।

কার্ত্তিক ৬৫১ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ ৬৫২ সংখ্যা।

পৌষ ৬৫৩ সংখ্যা।

মাঘ ৬৫৪ সংখ্যা।

ফাল্গুন ৬৫৫ সংখ্যা।

চৈত্র ৬৫৬ সংখ্যা।

অকারাদি বর্ণক্রমে চতুর্দ্দশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র

চতুর্দ্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

কার্ত্তিক ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৫১ সংখ্যা — ১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्

सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया

पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

বৈদান্তিক মত। *

আজকাল নবীনতর বেদান্তীগণ না বুঝিয়া বেদান্তের কপোলকল্পিত অর্থ করিয়া জগতের হানি করিতেছেন, মনুষ্যগণকে অভিমানাদি দোষে প্রবৃত্ত করাইয়া দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিতেছেন এবং অল্পজ্ঞানী লোকেরাও এই মতে দীক্ষিত হইয়া অধর্ম্ম, অনৈশ্বর্য্য পরাধীনতারূপ কালপাশে বদ্ধ হইতেছেন। (১) তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া মানেন, (২) কেহ বা নিজে পাপানুষ্ঠান করিয়া বলেন আমি অকর্ত্তা অভোক্তা (৩) কেহবা বলেন জগৎ মিথ্যা ইহা কল্পিতমাত্র (৪) কেহ বা মোক্ষ অর্থে জীবের লয় বুঝেন। এই চারি সম্প্রদায়ের মতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনই বর্ত্তমান প্রস্তাবের লক্ষ্য।

১। যাঁহারা বলেন জীবই ব্রহ্ম তাঁহারা প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া থাকেন "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"; এবং ইহাও বলেন যে এই প্রমাণটি ঋক্‌বেদের। কিন্তু সমগ্র ঋক্‌বেদের আট অষ্টকের ভিতরে এ কথা কোথাও নাই। বেদের ব্যাখ্যান যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তাহাতে এইটুকু মাত্র আছে, যে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"। অর্থাৎ "প্রকৃষ্টং জ্ঞানং যস্মিন্ তৎ প্রজ্ঞানং প্রকৃষ্টজ্ঞানস্বরূপং" যাঁহাতে প্রকৃষ্ট সর্ব্বোত্তম অনন্ত জ্ঞান আছে তিনিই প্রজ্ঞান; অর্থাৎ এই বিশেষণে ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে অবিদ্যান্ধকার বা অজ্ঞানের লেশমাত্র তাঁহাতে নাই, ছিল না, ও তাঁহাতে থাকিতে পারে না। তিনি সকল অপেক্ষা বৃদ্ধ, সকলের শ্রেষ্ঠ, ভক্তগণের একমাত্র মোক্ষসুখ ও অনন্তানন্দদাতা; ইহাই পরমাত্মার স্বরূপ। কিন্তু নবীন বৈদান্তিকগণ ঐ শ্রুতিটীকে মহাবাক্য কহেন। ফলত কোন ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে ইহা মহাবাক্যরূপে উক্ত হয় নাই।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" বৈদান্তিকগণ ইহার এরূপ অর্থ করেন যে আমি ব্রহ্ম, ভ্রান্তিবশত জীব হইয়াছিলাম, এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি যে আমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। ফলতঃ পূর্ব্বাপর গ্রন্থের সহিত এই বাক্যের সম্বন্ধ লক্ষ্য না করিবার দো-

* দয়ানন্দ সরস্বতীকৃত "বেদান্তিদ্ধান্ত নিবারণম্" নামক হিন্দী গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

যেই যত গণ্ডগোল ঘটিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহার অর্থ অন্যরূপ। শতপথ ব্রাহ্মণ, কাণ্ড ১৪, প্রপাঠক, ৩ কণ্ডিকা ১৮ তে আছে

"আত্মেত্যেবোপাসীত। অন্তত্র হোস্তে সর্ব্বহএকী ভবন্তীত্যুপক্রম্য তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা সযোঽন্য-মাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীশ্বরোহ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।"

ইহার ফলিতার্থ এই "অততি সর্ব্বত্র ব্যাপ্নোতীতি আত্মা পরমেশ্বরঃ" যিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই আত্মা পরমেশ্বর। সকল জীবের পক্ষে তাঁহাকে উপাসনা করা চাই এবং তাঁহাকেই সকল অপেক্ষা প্রিয়রূপে ধারণা করা চাই। তিনি পুত্রবিত্তাদি অপেক্ষা প্রিয়তম, অন্তরতর আত্মারও অন্তর্যামী। সকলের আত্মা স্বরূপ এই পরমাত্মাকে প্রিয় না জানিয়া যিনি অপরকে প্রিয় কহেন তিনি দুঃখসাগরে নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন।

আত্মানমের প্রিয়মুপাসীত স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।

আর যিনি সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বশক্তিমান ন্যায়কারী নিরাকার অজ পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করেন তিনিই কেবল ইহলোক পরলোকে ও মোক্ষাবস্থায় সর্ব্বানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। এবং ঈশ্বরকৃপায় ঈশ্বরোহ তথৈব স্যাৎ তাবৎ মনুষ্যের মধ্যে পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া সমর্থ-সত্তাবান হয়েন। ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি, পরব্রহ্মের উপাসকের আনন্দ কিছুতেই নষ্ট হয় না। তিনি সর্ব্বদা স্থিরসুখ উপভোগ করেন। অত্র হ্যেতে সর্ব্বএকী ভবন্তি, ব্রহ্মজ্ঞানবলে সকলের প্রতি প্রীতিমান হইয়া যেমন নিজের তেমনি পরেরও সুখ দুঃখ তুল্যভাবে তিনি অনুভব করিতে থাকেন; এবং মনুষ্য মাত্রেরই সুখে একীভূত হইয়া তিনি সকলের মধ্যে একইরূপ সুখ বিস্তার করিবার প্রয়াসী হয়েন। তিনি সকলকে তুল্য দৃষ্টিতে দেখেন। ব্রহ্মবিৎ বলেন যে সেই এক পরমেশ্বরের সামর্থ্যবলে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, একমাত্র তিনিই জগৎ সৃষ্টির মূলে বিদ্যমান ছিলেন, "তৎ ব্রহ্মাবেৎ" তিনিই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছেন। যিনি ঘোর অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার আলোক প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই ব্রহ্মের নিত্যসুখ লাভ করেন। যিনি বিজ্ঞানবলে সমাধিযোগে ঈশ্বরকে এইরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম "য এবং বেদ" তাঁহারই ধারণা হইবে "অহং ব্রহ্মাস্মীতি" "আমি ব্রহ্ম" অর্থাৎ আমি ব্রহ্মস্থ। ব্রহ্ম আমার অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, আমিই তাঁহারই নিত্যসুখ ভোগের অধিকারী। যেমন আকাশ হইতে গৃহ ভিন্ন নহে, গৃহ হইতে আকাশ ও ভিন্ন নহে, অথচ আকাশ ও গৃহ এক নহে, কিন্তু পরস্পর পৃথক, তেমনি জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ব্যাপ্য ও ব্যাপক সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাঁহারা একভাবে ভিন্ন আর একভাবে অভিন্ন। বৃহদারণ্যকে ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে আছে

"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।"

যে পরমাত্মা তোমার অন্তর্য্যামী উপাস্য অমৃত পুরুষ, যিনি তোমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন অথচ তোমা হইতে পৃথক, যাঁহাকে তুমি জান না, যিনি তোমার শরীর, যিনি তোমার অভ্যন্তরে স্থিতি

করিতেছেন, যিনি তোমার নিয়ন্তা, সেই অন্তর্য্যামী বিধাতা পুরুষকে ছাড়িয়া অন্য কাহারও উপাসনা করিও না। লোকে ইহা অবধারণ করিতে না পারিয়া অভিমান বশে বলিয়া থাকে যে আমিই ঈশ্বর, ঈশ্বরের আবার উপাসনা কি। এইরূপে লোকে সম্যক বিচার না করিয়া বেদান্তের দুই চারি অক্ষর শিখিয়া যাহা মনে করে তাহাই বলিতে সাহসী হয়।

"তত্ত্বমসি" যাহা বৈদান্তিকগণের নিকট মহামূল্য সামগ্রী তাহাও সামবেদের বচন নহে, কিন্তু সামব্রাহ্মণান্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের কথা। পূর্ব্বাপর প্রকরণ ছাড়িয়া দিয়া নবীন বৈদান্তিকগণ ইহার অর্থ বিকৃত করিয়া মহান অনর্থ ঘটাইয়াছেন। মূলে এই আছে

"সযহ এষোণিমৈ তদাত্মামিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।"

উদ্দালক আপন পুত্র শ্বেতকেতুকে উপদেশ করিতেছেন সেই পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মা যিনি সমস্ত জগতের আত্মা তিনি কিরূপ, না তিনি "অণিমা" অত্যন্ত সূক্ষ্ম। অর্থাৎ প্রকৃতি আকাশ জীবাত্মা হইতেও সূক্ষ্ম; তিনি সত্যস্বরূপ। হে শ্বেতকেতু! তিনি সকল জগতের অন্তর্য্যামী আধারভূত, নির্ব্বিকার, অবিনশ্বর; "স আত্মা" তিনি সকলের আত্মা; তাঁহা অপেক্ষা সকলের অন্তরতম আর কেহই নহেন। হে শ্বেতকেতু! যিনি সকলের আত্মা তিনি তোমারও অন্তর্য্যামী।

"তদন্তর্যামী তদধিষ্ঠানস্তদাত্মকত্বমসীতি ফলিতার্থঃ"

তত্ত্বমসি অর্থে তৎসহচারণ বা তৎসহচার উপাধিই বুঝায়।

"যষ্টিকাং ভোজয় অর্থাৎ যষ্টিকয়া সহচরিতং ব্রাহ্মণং ভোজয়েতি গম্যতে, তথৈব তৎব্রহ্মসহচরিতস্ত্বমসীত্যবগন্তব্যং তথা অহং ব্রহ্মাস্মীত্যত্রাহং ব্রহ্মসহচরিতো বা ব্রহ্মস্থোস্মীতিবিজ্ঞেয়োঽর্থঃ তাৎস্থ্যোপাধিনা, যথা মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীত্যত্র.মঞ্চস্থাঃ ক্রোশন্তীতি বিজ্ঞায়তে এবং যত্রযত্রাসংভব আগচ্ছেত্তত্র তত্রোপাধিনোঽর্থো বেদিতব্যঃ (অত্র ন্যায়দর্শনস্য দ্বিতীয়াধ্যায়স্থং চতুষষ্টিতমং সূত্রং প্রমাণমস্তি) সহচরণস্থানতাদর্থ্যবৃত্তমানধারণসামীপ্যযোগসাধনাধিপত্যেভ্যোব্রাহ্মণমঞ্চকটরাজশক্তুচন্দনগঙ্গাশাটকান্নপুরুষেষতদ্ভাবেপি তদুপচারঃ। এষু দশবিধাসংভবেষু বাক্যার্থেষু দশোপাধয়ো ভবন্তীতিবেদ্যম্।"

অর্থাৎ "যষ্টিককে ভোজন করাও অর্থে যষ্টিসহচারী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাও বুঝিতে হইবে; "তৎত্বমসি" অর্থে তোমার সহচারী ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থে আমি ব্রহ্মসহচারী বা ব্রহ্মস্থ বুঝিতে হইবে। ন্যায়ের ও অলঙ্কারের তাৎপর্য্যই এই। যথা—"মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি" ইহার অর্থ মঞ্চস্থ (মাচাস্থিত) লোকেরা ক্রন্দন করিতেছে বুঝিতে হইবে, মাচা কাঁদিতেছে এইরূপে বুঝিলে চলিবে না। এইরূপে যেখানে যেখানে অসম্ভব অর্থ প্রতীয়মান হইবে সেইখানে তাহার উপাধিগত অর্থ বুঝিতে হইবে। ন্যায়দর্শনের ২য় অধ্যায়ের ৬৪ তম সূত্রে এইরূপ বিধি আছে। প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব ভ্রান্ত্যাদিদোষরহিতত্ব প্রভৃতি বিশেষণ ব্রহ্মব্যতীত জীবে সম্ভবিতে পারে না।

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইহাকে অনেকে অথর্ব্ববেদের বাক্য কহেন। কিন্তু ইহা অথর্ব্ববেদের বাক্যই নহে। কিন্তু মাণ্ডুক্য উপনিষদের কথা। ইহার সরল তাৎপর্য্য এই যে বিচারশীল পুরুষ আপনার অন্তর্যামীকে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন যে যিনি আমার অন্তর্যামী আমার উপাস্য দেবতা তিনিই ব্রহ্ম।

যোসাবাদিত্যে পুরুষঃসোঽসাবহম্। ইহা যজুর্ব্বেদের ৪০ অধ্যায়ের কথা।

ইহার অর্থ এই যে যিনি আদিত্যে অর্থাৎ যিনি আমার প্রাণে তিনি আমার জীবাত্মা। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে আদিত্যো বৈ প্রাণঃ অর্থাৎ আদিত্য শব্দ প্রাণকে বুঝায়। "আদিত্যো হবৈ প্রাণোরয়িরেব চন্দ্রমা" মুণ্ডকোপনিষদ। যিনি প্রাণের পূর্ণপ্রাণ প্রাণের প্রেরক তিনি আমার আত্মার মধ্যে রহিয়াছেন।

যদ্বা পরমেশ্বরোভিবদতি হে জীবাঃ যঃ অসৌ আদিত্যে বাহ্যে সূর্য্যে কিং বা অন্তর্গতে প্রাণে স অসৌ অহমেবাস্মীতি মা বিত্ত।

তিনি অন্তরে বাহিরে সূর্য্যাদি স্থূল জগতে আকাশাদি সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে বিরাজমান, আমিও যাঁহাদ্বারা পরিপূর্ণ, তাঁহারই এখানে প্রার্থনা হইতেছে। ইহার পূর্ব্ব শ্লোকে আছে অগ্নে নয় ইত্যাদি।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য উপনিষদ) এখানেও তাৎস্থ্যোপাধি বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ন্যায়ের সূত্রানুসারে ইদং সর্ব্বং জগৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মস্থং, যদ্বা ইদং যজ্জগদাধিষ্ঠানং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মৈব নাত্র কিঞ্চিৎ বস্তন্তরং মিলিতমিতি বিজ্ঞেয়ম, যথেদং সর্ব্বংঘৃতমেব নেদং তৈলাদিভির্মিশ্রিতমিতি।

অর্থাৎ ইহা সমুদয়ই ব্রহ্ম অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্মস্থ, কেবল মাত্র ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত, অন্য কিছুতে নহে। যেমন সর্ব্বং ঘৃতং বলিলে নিরবচ্ছিন্ন ঘৃতময় আদৌ তৈলাদি মিশ্রিত নহে বুঝায়, তেমনি সর্ব্বং ব্রহ্ম বলিলে একমাত্র ব্রহ্মেরই অধিষ্ঠানতা বুঝায়, অপর কাহারও সম্বন্ধ নাই, ইহাই অনুসূচিত হয়।

২। এই শরীরের কর্ত্তা ও ভোক্তা এক জীব অর্থাৎ জীবাত্মা। মনুষ্যদেহের সমস্তই এই জীবের অধীন। ফলত পাপপুণ্যের কর্ত্তা এই জীব ভিন্ন আর কেহই নহেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ব্যাসসূত্র ও বেদাদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই—শ্রোত্রেণ শৃণোতি, চক্ষুষা পশ্যতি, বুদ্ধ্যা নিশ্চিনোতি মনসা স কল্পয়তি অর্থাৎ এই জীবাত্মা শ্রোত্রের দ্বারাই শ্রবণ করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় করে মন দ্বারা কল্পনা করে। যেমন অসিনা ছিনত্তি শিরঃ, অসি দ্বারা শিরশ্ছেদন করিতেছে বলিলে ছেদনের কর্ত্তা মনুষ্য, সাধন তরবারি, শির ছেদনের কর্ম্ম হয় এবং তজ্জনিত পাপ ও শাস্তি ছেদনের কর্ত্তাকে অর্শায়, তরবারে অর্শায় না, তেমনি শ্রোত্রাদি জনিত পাপ পুণ্যের কর্ত্তা ও ভোক্তা জীব, তদতিরিক্ত অন্য কেহ নহেন। গৌতম মুনি ও ব্যাসাদিও এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন—ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি। ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞান আত্মারই লিঙ্গ। "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" অন্য (জীবাত্মা) সুখে ফলভোগ করেন, ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে জীবই যে পাপপুণ্যের কর্ত্তা এবং সুখদুঃখের ভোক্তা ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। লোকে বিষয়ভোগ তৃপ্তির জন্য বলিয়া থাকেন জীব অকর্ত্তা অভোক্তা; পাপপুণ্য আবার কি।

৩। অনেকে বলেন জগৎ মিথ্যা কল্পিত, কিন্তু এরূপ বিশ্বাস অবিদ্যান্ধকারের মাহাত্ম্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—

সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।

অর্থাৎ যাহার মূল সত্য তাহার বৃক্ষ কিরূপে মিথ্যা হইবে? যে পরমেশ্বরের সামর্থ্য এই জগতের কারণ, তিনি নিত্য। কেন না পরমাত্মা নিত্য হইলে তবে তাঁহার সামর্থ্য নিত্য হইতে পারে। তাঁহা হইতে যখন জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহা মিথ্যা হইবে কিরূপে। "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেপি তৎতথা" আদি ও অন্তে যাহার বিদ্যমানতা নাই, বর্ত্তমানে

তাহা কি প্রকারে থাকিতে পারে, যদি কেহ এরূপ যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহার উত্তর এই যে ঈশ্বরের সামর্থ্যরূপে জগৎ পূর্ব্বে (অব্যক্ত ভাবে) ছিল, এখনও আছে, পরেও (প্রলয়াবস্থায় অব্যক্ত ভাবে ঈশ্বরেই) থাকিবে। যদি কেহ বলেন যে সংযোগজন্য পদার্থ (পরমাণুর সমষ্টিজাত বলিয়া) সংযোগের পূর্ব্বে বা বিয়োগের পরে (প্রলয়ান্তে) কিরূপে থাকিতে পারে। তাহার উত্তর এই যে বিদ্যমান সৎপদার্থেরই সংযোগ হইতে পারে, যাহার বিদ্যমানতা নাই তাহাদের আবার সংযোগ কি। যাহার বিদ্যমানতা আছে, তাহার পরমাণু সকল বিযুক্ত হইয়া গেলেও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ রহিয়া যায়। ঈশ্বরের সামর্থ্যই জগতের কারণ, এবং উহা নিত্য, ঈশ্বরের ঐ চিরন্তন স্বাভাবিক শক্তিগুণেই জগৎ রচিত হইতেছে, তিষ্ঠিতেছে, এবং প্রলয় দশা প্রাপ্ত হইতেছে।

(৪) অনেকে বলেন জলবিন্দু যেমন সমুদ্রবারিতে মিশাইয়া যায়, লয়ও তেমনি, কিন্তু ইহা লয়ের প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে।

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টেত তমাহুঃ পরমাং গতিং।

অর্থাৎ জীবের মোক্ষের অবস্থায় পাঁচ ইন্দ্রিয়জ্ঞান (বৃত্তি) মনের সহিত অর্থাৎ বিজ্ঞানের সহিত স্থির হইয়া দাঁড়ায়, বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি আর চেষ্টা করে না, শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা পরমানন্দ স্বরূপে যুক্ত হইয়া সর্ব্বদা আনন্দ অনুভব করিতে থাকে। ইহাকেই পরম গতি বা মোক্ষ কহে।

পরমজ্যোতিরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিস্পদ্যতে ইতি শ্রুতি বৃহদারণ্যকস্য।

অর্থ, পরম জ্যোতি যে পরমাত্মা তাঁহার অত্যন্ত সমীপতা প্রাপ্ত হইয়া, (স্বেন রূপেণ) অর্থাৎ অবিদ্যাদি দোষ হইতে পৃথক হইয়া পরিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ স্বসামর্থ্য সম্পন্ন জীব মুক্ত হইয়া যায়। শারীরিক সূত্রের চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদেও মুক্তির তাৎপর্য্য ঐরূপ নিরূপিত হইতেছে।

অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্।

অর্থাৎ বাদরির মতে মোক্ষাবস্থায় ইন্দ্রিয় বা শরীরাদি জীবের সহিত থাকে না। কিন্তু মন থাকে।

ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামননাৎ।

কিন্তু জৈমিনি আচার্য্য কহেন মুক্তাবস্থায় দেহ থাকে ও মুক্ত ব্যক্তি নিরতিশয় আনন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

বাদরায়ণ অর্থাৎ ব্যাসের মত এই যে

দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ।

বাদরায়ণ, বাদরি ও জৈমিনির মত সমন্বয় করিয়া কহিতেছেন যে (মৃতাশৌচান্ত দ্বাদশাহ শব্দের ন্যায়) মুক্তাবস্থায় ভাব ও অভাব দুইই থাকে, অর্থাৎ স্থূলশরীর ও অবিদ্যাদি ক্লেশের অত্যন্ত অভাব, এবং জ্ঞান ও আত্মার পরিশুদ্ধ স্বশক্তির ভাব ইহাই মোক্ষ। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে লাভ করিলে জীব একদিকে জন্ম মরণাদি দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, অন্যদিকে নিরতিশয় আনন্দে নিমগ্ন থাকে, ইহাই মোক্ষ।

গৌতম ঋষিরও এই মত। তিনিও স্বীয় ন্যায়দর্শনে লিখিয়াছেন

দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ। ২। বাধনালক্ষণং দুঃখম্। ২১। তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ। ২২।

অর্থ। মিথ্যাজ্ঞানপ্রযুক্ত জড়ে চেতনবুদ্ধি, ও চেতনে জড়বুদ্ধি হয়। ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি পাইলে, জীবের অবিদ্যাদি দোষ তিরোহিত হইয়া যায়। তাহা হইতে বিষয়াসক্তি নষ্ট হয়। বিষয়াসক্তি অর্থাৎ

প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইলে আর জন্ম হয় না। জন্ম ছুটিয়া গেলে দুঃখও ছুটিয়া যায়। সর্ব্ববিধ দুঃখ ছুটিয়া গেলে জীব অপবর্গ বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন। বাধনা অর্থাৎ বিবিধ প্রকার পীড়া বা কষ্ট উহার অত্যন্ত নিবৃত্তি হইলে জীব মুক্তিলাভ করেন। এইরূপে আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে যে মোক্ষ অর্থে জীবের লয় নহে, কিন্তু জীবের অত্যন্ত আনন্দভোগের অবস্থা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্বচনম্।

অর্থ যিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে আত্মস্থ করিয়া জানেন বা প্রাপ্ত হয়েন, তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সহিত সমুদায় কামনার বিষয় উপভোগ করেন অর্থাৎ সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সহিত সদানন্দে অবস্থিতি করেন। যাঁহারা মোক্ষ অর্থে জীবের লয় বুঝেন, তাঁহাদের মতে বিবেকাদি সাধন নিতান্তই নিষ্ফল। লয়ে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য ধরিলে ব্রহ্মও একভাবে ভ্রান্ত ও অজ্ঞানী হইয়া পড়েন। কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে—ব্রহ্ম যিনি তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং কবিরিত্যাদি" পরিশুদ্ধ পাপরহিত সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাতে অজ্ঞানাদি দোষ কখনই আসিতে পারে না; তিনি দেশ কালের অপরিচ্ছেদ্য। ভ্রান্ত্যাদি দোষ অল্পজ্ঞ জীবে তাঁহাতে নহে। যদি কেহ বলেন—

"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ অনেনাত্মনা জীবেনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।" তৈত্তিরীয়োপনিষদ্।

অর্থ। ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, এবং জীবাত্মারূপে শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। তাহার উত্তর এই যে এরূপ অর্থ নিতান্তই অনর্থকর।

শরীরং প্রবিষ্টো জীবঃ জীবমনুপ্রবিষ্ট ঈশ্বরোস্তীতি গম্যতে।

জীব শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এবং ঈশ্বর জীবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। শ্রুতি প্রমাণ এই যে

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

এক শরীর মধ্যে জীবাত্মা আর পরমাত্মা রহিয়াছেন, তাঁহারা পক্ষীর ন্যায় একই বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। ইহার উপর যদি কেহ বলেন যে জীব ও ঈশ্বর একই, তিনি নিতান্তই অর্ব্বাচীন। ঈশ্বর আপনার সামর্থ্যবলে জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন। প্রমাণ—

তমস্যাপারে রজসো ব্যোমনঃ স্বভূত্যোজা অবসে ধৃষন্মনঃ। চকৃষে ভূমিং প্রতিমানমোজসোঽপঃস্বঃ পরিভূরেষ্যা দিবম্। ঋগ্বেদ সংহিতা অঃ ১, অ ৪, ব ১৩ ম ১২।

হে পরমেশ্বর। তুমি আপনার "স্বভূত্যা" সামর্থ্য ও "ওজস" পরাক্রমে ভূমি জল, স্বর্গ দিব অর্থাৎ ভূমি হইতে সূর্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ সৃষ্টি রক্ষা ও প্রলয় করিতেছ।

ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী অনুব্যচো ন সিন্ধবো রজসো অন্তমানশুঃ নোত স্ব বৃষ্টিং মদে যস্য যুধ্যতএকো অন্যচ্চকৃষে বিশ্বমানুষক্। ঋক সং, অ ১, অ ৪, বঃ ১৪, মন্ত্র ১৪।

হে পরমেশ্বর! এক অসহায় বিশ্ব তোমারই অনুসঙ্গী, ইহা তোমারই রচনা, তুমিই ইহার অবলম্বন! কিন্তু ইহা তোমা হইতে স্বতন্ত্র, ইহা তোমার স্বরূপভূত নহে।

অন্যদ্বিশ্বং স্বস্মাদ্ভিন্নং ত্বং চকৃষে কৃতবানসি।

এই জগৎ তোমার স্বরূপ হইতে অন্যৎ ভিন্ন, তুমি ইহার রচয়িতা, কিন্তু তুমি জগৎরূপ নহ।

"অণোরণীয়ান্মহতোমহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্ তমক্রতুং পশ্যতি বীতাশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ। নিত্যো২নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকোবহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যে২নুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।

যিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম মহৎ হইতে মহৎ, যিনি জীবদিগের আত্মাতে নিহিত বা স্থিত, অর্থাৎ যাঁহাকে সাধকেরা ধ্যানপ্রভাবে আত্মার মধ্যে দেখিতে পান ইত্যাদি। ইহাতে জীব ও ব্রহ্মের ব্যাপ্য ব্যাপক অন্তর্যামী অন্তর্যাম্য সম্বন্ধই নিরূপিত হইতেছে; এবং জীব ও ব্রহ্ম যে এক নহেন তাহাই ভূয়োভূয় বলা হইতেছে। ব্যাসসূত্রে আছে "নেতরো২নুপপত্তেঃ" ইতরজীব জগতের স্রষ্টা বা কারণ হইতে পারে না। "ভেদব্যপদেশাচ্চ" ব্রহ্ম ও জীব উভয়ে ভিন্ন। "মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ" মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া আনন্দী হয়েন। "প্রাণভৃচ্চ" প্রাণধারী জীব জগতের কারণ নহেন। "বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং নেতরৌ" বিশেষণ দিব্য সর্ব্বজ্ঞাদি ইহাই ভেদব্যপদেশ; জীব ও প্রকৃত্যাদি হইতে পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ এ কারণ জীব ও প্রকৃতি জগতের কারণ নহেন। এইরূপে ব্যাসের শারীরক সূত্রেরও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত যে জীব ও ব্রহ্ম এক নহেন। কিন্তু নবীন বেদান্তীগণ প্রথমতঃ জগৎকে মিথ্যা কহিয়া ও দ্বিতীয়ত জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করিয়া সাধারণের বড়ই অনিষ্ট করিতেছেন। তাঁহাদের মতানুযায়ী হইলে জগতের উন্নতি, পরস্পরের প্রতি প্রীতি, বিদ্যাদি শিক্ষায় পুরুষার্থলাভ ও শ্রদ্ধাদি সমুদায় নিস্ফল হইয়া পড়ে। পরমেশ্বরের আজ্ঞাপালন স্তুতি প্রার্থনা উপাসনা ও আত্মপ্রসাদের পরিবর্ত্তে মিথ্যাভিমান স্বার্থসাধন দুক্রিয়াশক্তি পাপে প্রবৃত্তি বিষয়ভোগ জগতের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অর্থহীন হইয়া পড়ে। অতএব সকলের কর্ত্তব্য যে শাস্ত্রের নিগূঢ় অর্থ অবগত হইয়া,বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য নিরূপণ করিয়া তাহাই যেন জগতে প্রচার করেন, এবং ভ্রমপ্রমাদ ও মোহের হস্ত হইতে ইতরজনসাধারণকে রক্ষা করেন।

উপদেশ।

মনুষ্যের যতগুলি রিপু আছে তন্মধ্যে ঈর্ষা একটী প্রবল রিপু। পরের সুখ সৌভাগ্য-দর্শনে মর্ম্মাহত হওয়ারই নাম ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা। যে ব্যক্তি পরের কোনরূপ শুভ-সন্দর্শন বা শুভ-সমাচার শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হয়, তাহার ক্ষণকালের জন্যও সুখ-শান্তি-সম্ভোগ ভাগ্যে ঘটে না। শাস্ত্র বলেন,—

"য ঈর্ষুঃ পরবিত্তেষু রূপে বীর্য্যে কুলান্বয়ে।
সুখসৌভাগ্যসৎকারে তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ॥"

অন্যের ধনে, রূপে, বীর্য্যে, কুলে, সুখে, সৌভাগ্যে ও সদনুষ্ঠানে যে ঈর্ষা করে, তাহার ব্যাধির অন্ত নাই। পরশ্রীকাতরতা অশেষ আধ্যাত্মিক মহাব্যাধির আকর। নির্য্যাতন-স্পৃহা, মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি-রাশি ঈর্ষার নিত্য সহচরী। ইহার প্রভাবে সময়ে সময়ে 'ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শক্রুঃ' দুর্জ্জয় শত্রু ক্রোধের উৎপত্তি। ঈর্ষা ক্রমশঃ অন্যান্য রিপুকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। একদিকে ঈর্ষার প্রভাবে যেমন প্রায় সমস্ত দুষ্প্রবৃত্তি সমুত্তেজিত হয়, সমস্ত অন্তঃশত্রু প্রশ্রয় পায়,—অপরদিকে তাহাদিগের অত্যাচারে মনুষ্যের সদ্গুণ ও সৎপ্রবৃত্তি সমূহ নিষ্পন্দ —নিস্তব্ধ—মৃত প্রায় হইয়াপড়ে।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্য মক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ; কিন্তু ঈর্ষার প্রভাবে মনুষ্য হৃদয়ে—ইহাদের একটিও স্থানপ্রাপ্ত হয় না, এবং

"আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।"

সর্ব্বভূতের প্রতি আত্মবৎ ভাব এই মহানীতির তত্ত্ব অর্থাৎ পরের সুখ-দুঃখাদির প্রতি মমত্ব এবং ঈশ্বরের সঙ্গে মানব-সাধারণের বন্ধনের ঐক্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য থাকে না; সুতরাং ঈর্ষা মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্যুত করে, নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হিংস্র জন্তু হইতেও হিংস্র করিয়া তোলে। ঈর্ষী পরের সর্ব্বনাশ চেষ্টা করিয়া পরের প্রাণে যেমন দারুণ আঘাত করে তেমনি নিজেও সে ক্ষণকালের জন্য সুখী হইতে পারে না। সর্ব্বদাই পরশ্রীকাতরের প্রাণ দুশ্চিন্তা-জড়িত, নিরানন্দ ও গভীর দুঃখান্বিত। তাহাকে নিরন্তর হৃদয়ে পাপ বৃশ্চিকের কঠোর দংশন সহ্য করিতে হয়। যাহার অন্তঃকরণ নিরন্তর অনন্ত দুশ্চিন্তায় পর্য্যাকুল, তাহার কথন ও নিয়মিত ভোজন ও সুনিদ্রা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; শয়ন ভোজনের ব্যতিক্রম হইলেই বিবিধ শারীর-ব্যাধি সমুৎপন্ন হয়; তখনই শাস্ত্রের সেই মহাবাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়—'তস্য ব্যাধিরনন্তকঃ'। অন্য পাপের ফল কিছু কাল-বিলম্বে প্রকাশিত হয়, কিন্তু ঈর্ষার শোচনীয় পরিণাম তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয়। ঈর্ষা আমাদিগকে জীবনের উচ্চ লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া নরকের গভীর গর্ত্তে নিক্ষেপ করে, দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মের অবশ্য-লভ্য ভগবৎ-প্রেম-ভক্তির অধিকার হইতে প্রচ্যুত করিয়া নৈরাশ্যের অনলকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ বিদগ্ধ করে; তাহার প্রভাবে এই সুদুর্ল্লভ মানব-জন্ম অর্থশূন্য হয়, সংসার মরুভূমি হয়, সর্ব্বপ্রকার সুখ শান্তির মূলোচ্ছেদ হয়। অজ্ঞানই ঈর্ষাদি রিপুকুলের খনি; সুতরাং ইহাদের বিনাশ-সাধনে জ্ঞানই আমাদের একমাত্র সহায়, অজ্ঞান-সমুত্থ দোষ-রাশির বিনাশে জ্ঞানই একমাত্র অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র; সেই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন;—

"সর্ব্বমজ্ঞানজংপাপং ছিন্দ্যাদ্ জ্ঞানাসিনা বুধঃ।"

প্রাজ্ঞব্যক্তি জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা অজ্ঞানজ পাপরাশির উচ্ছেদ করিবেন। কিন্তু কেবল শাস্ত্রপ্রমাণ কণ্ঠস্থ করিয়া এবং মহাপুরুষদিগের সার-গর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়াই আমরা জ্ঞানী হইতে পারি না; তাহা জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান মাত্র। এই প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান হইয়াই আমরা আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করি, তজ্জন্যই আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন—

"চতুর্ভিশ্চ উপায়ৈর্ব্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি, আগমকালেন স্বাধ্যায়কালেন প্রবচনকালেন ব্যবহারকালেন চেতি।"

গুরুর নিকট হইতে গ্রহণকাল, নিজের অধ্যয়ন অর্থাৎ অভ্যাস কাল, অধ্যাপন বা অভ্যস্ত তত্ত্বের প্রকাশ কাল এবং ব্যবহার কাল অর্থাৎ জীবনের কার্য্যের সঙ্গে অধিগত তত্ত্বের সংমিশ্রণকাল, এই চারি প্রকারে বিদ্যা উপযুক্তা হয়। এই চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা উপযুক্ত না হইলে বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান অবিদ্যার অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশে সমর্থ হয় না। জ্ঞানের প্রমাণ কণ্ঠস্থ করিলে, জ্ঞানের মহোপকারিত্বের সুন্দর মনোরম সহস্র

বর্ণনা পাঠ করিলেও অজ্ঞান ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করে না; কিন্তু পূজ্যপাদ পতঞ্জলি-কথিত পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ উপায়ের প্রভাবে যখন মোহমেঘ উদ্‌ভেদ করিয়া হৃদয়াকাশে প্রদীপ্ত জ্ঞান-সূর্য্যের অভ্যুদয় হয়, তখন ঘোর বিভীষিকাময় অজ্ঞানান্ধকার তস্করের ন্যায় দূরে পলায়ন করে—এবং পূর্ণসুখের সুবিমল বদনকান্তি মনুষ্যের নিকটে প্রতিভাত হয়।

আমাদের এমন শুভদিন কবে হইবে, কবে আমরা ঈর্ষার মূলোচ্ছেদ করিয়া প্রেমসাগরে অবগাহন করিব? কবে আমরা প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকে অনন্ত প্রেমের সুমধুর গন্ধে অপার আনন্দ লাভ করিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিব? কবে আমরা ঈশ্বরকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া ভক্তির মালা উপহার দিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে সরল প্রাণে প্রফুল্ল বদনে বলিতে পারিব,—

> হে দেব! দাসস্য গৃহাণ সর্ব্বং,
> যত্তে প্রিয়ং কারয় মাং তদেব।
> ত্বমেব শক্তির্গতিরাশ্রয়ো মে,
> আস্তাং বিভো! ত্বাং প্রতি নিত্যযোগঃ॥

প্রার্থনা। (২)

নামে রুচি।

রাখিব তোমার নাম হৃদয়ে গাঁথিয়া।
পরাণ পবিত্র হয় সে নাম গাহিয়া॥
তব নাম সম সুধা কিবা আছে আর?
হউক সে সুধা-সিক্ত হৃদয় আমার॥
অরূপ তোমার রূপ না পায় নয়ন।
কৃপা করি কিন্তু হৃদে দাও দরশন॥
হৃদি প্রেমচন্দ্র রূপে তুমি সুধাময়।
আত্মার সুহৃদ্ বন্ধু আশ্রয় অভয়॥
ভবের কাণ্ডারী ভব ভয়ের নাশন।
তুমি মুক্তি দাতা ভব-বন্ধন-মোচন॥
একান্তে যে লয় তব চরণ শরণ।
ভব-পারে তুমি তারে কর উত্তারণ॥
দয়া করি তুমি তারে দাও দিব্য জ্ঞান।
জীবনের অর্থ সেই করে প্রণিধান॥
পান্থশালা জেনে এই ভবের ভবন।
পরিজনে দেখে হয়ে বৈরাগ্য-নয়ন॥
অকর্ত্তা আপনা জানি কর্ত্তা তোমা করে।
তোমারই দাস হয়ে সংসারে বিচরে॥
করে সে তোমার কর্ম্ম হেথা প্রাণপণে।
যখন তাহারে ডাক অমৃত-ভবনে॥
মঙ্গল আদেশ তব জানি সুনিশ্চয়।
মরণ ত্যজিতে তার আনন্দ-হৃদয়॥
জানে সে সেখানে তার হইবে মঙ্গল।
আত্মার যে মলিনতা কাটিবে সকল॥
যথা নাহি রোগ শোক বিলাপ ক্রন্দন।
যোগানন্দে ব্রহ্মানন্দ হইবে মিলন॥
নূতন তোমার কার্য্য সেখানে সাধিবে।
প্রেমানন্দে তব নাম নিয়ত গাহিবে॥
তুমি হরি, পাপ হর, পতিত-পাবন।
মহাপাপী যদি পাপ করিয়া বর্জ্জন॥
পাপ জন্য অনুতাপি করিয়া ক্রন্দন।
কাতরে তোমার কাছে করিয়া গমন॥
বলে নাথ! "অধমেরে করহে উদ্ধার।
মোহ-বশে আর কভু ভুলিব না আর॥
তব পথ সুধাময় আমারে দেখাও।
চলিতে তাহাতে মোরে শুভমতি দাও॥"
কৃপা করি তুমি তারে বল কি বচন।
নিমেষেতে হয় তার নূতন জীবন॥
হয় ত তাহারে কর সাধু গরীয়ান্।
তব নাম প্রচারিতে কর আজ্ঞা দান॥
তার কথা শুনে কত তরে যায় লোক।
হয় সে জগৎ—পূজ্য, জগৎ—আলোক॥
চরম সম্বল তুমি, চিরন্তন ধন।
তুমিই আত্মারে সেথা করিবে পালন॥
যে তোমারে হৃদি ধামে এই খানে পায়।
পাইবে আশ্রয় তব নিশ্চয় সেথায়॥

প্রেম-অন্ন দিয়া তারে সেথা নে তুষিবে।
কেবা জানে কত সুখ তুমি তারে দিবে॥
স্নেহময়ী মাতা তুমি—পিতা দয়াময়।
প্রেমের ভাণ্ডার হয় তোমার হৃদয়॥
দেখিতেছ আমাদিগে কত স্নেহ-ভরে।
দিতেছ কতই সুখ আমাদের তরে॥
সতত কতই বিঘ্ন করি নিরসন।
করিতেছ আমাদিগে রক্ষণ পালন॥
কত অপরাধ করি সংখ্যা নাহি তার।
কিন্তু করিতেছ ক্ষমা শত শত বার॥
অভাজনে কত দয়া করিছ বর্ষণ।
বুঝিতে না পারি তাহা কর কি কারণ॥
দেহের নিয়ম যাহা করেছ স্থাপন।
সুস্থ থাকে যেবা তাহা করিছে পালন॥
পাছে রোগে পড়ি করিতেছ সাবধান।
তোমার ইঙ্গিত বুঝে যেই প্রজ্ঞাবান্॥
রোগেতে ও তব দয়া বলি হারি যাই।
তোমারি ঔষধে বার বার প্রাণ পাই॥
পাপ-পথে যাহা হয় প্রথম স্খলন।
যাহা হ'তে ঘোরাবর্ত্তে দারুণ পতন॥
তাহা হ'তে তুমি রক্ষা কর হাত ধরি।
সখা হ'য়ে উপদেশ দাও দয়া করি॥
করিবে মলিন কায় চিন্তা বিসর্জ্জন।
তোমার পথেতে নর করিবে গমন॥
তাই তারে শুভ মতি করিছ বিধান।
নাহি হবে ধূলি লয়ে হেথা ম্রিয়মাণ॥
তুমি চাও—হবে নর তোমার প্রেমিক।
জ্ঞান ধর্ম্ম সোপানেতে উঠিবে ক্রমিক॥
ভ্রাতায় ভ্রাতায় সবে প্রেমেতে মিলিবে।
তোমার মঙ্গল কার্য্য একান্তে সাধিবে॥
চলে যদি তব পথে মানব সকল।
এখনি স্বরগ হয় এ ধরা মণ্ডল॥
জীবনের আস্বাদন, তুমি রসায়ন।
এক মাত্র তুমি হও তৃপ্তির কারণ॥
আত্মার গভীর তৃপ্তি দেয় কি বিষয়?
আত্মা কাছে ধন মান—কিছুই না হয়॥
কিন্তু তুমি তৃপ্তি-খনি—তোমার স্মরণ।
অহরহ তোমা সঙ্গে জীবন যাপন।
অহরহ হৃদয়েতে তব সহবাস।
পূর্ণ করে আত্মার যা উচ্চ অভিলাষ॥
শান্তির আলয় তুমি হৃদয়ের নাথ।
কোটি কোটি জন্ম যদি থাকি তব সাথ॥
তথাপি তোমাকে আত্মা কেবলি চাহিবে।
তব প্রেম-সুধা তরে পিপাসু থাকিবে॥
প্রেমের সাগর তুমি নয়ন-অঞ্জন।
হৃদয়ের প্রিয়ধন দুঃখ নিবারণ॥
পরম সম্পদ তুমি পরম সহায়।
আত্মা যদি পায় তব সুশীতল ছায়॥
স্বরগের ভোগ তার এইখানে হয়।
ভব-রোগ তবে তার নাশে সমুদয়॥
তব নামামৃতে রুচি সবে তুমি দাও।
জপিতে সে নাম-সুধা সবারে শিখাও॥

দুর্গোৎসব।

বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল। এখন যেন এই মহাদেশ একরূপ নীরব নিঃস্তব্ধ। কএক দিনের উৎসাহ ও উদ্যম যেন কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। যা হৌক, এইটী বঙ্গদেশের হৃদয়োৎসব। এই উৎসবে মৃন্ময়ী দেবীমূর্ত্তিই উপাস্য। আমরা অবশ্য মূর্ত্তি-পূজার বিরোধী। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা দেখাইতে চাই এই মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তনায় ঋষিদিগের কি গূঢ় অভিসন্ধি ছিল এবং বর্ত্তমানে তাহা কতদূর ফলবৎ হইয়াছে। ঋষিরা ভাবিয়াছিলেন জ্ঞানমার্গ অনেকেরই পক্ষে দুরধিগম্য। তাহাতে প্রবেশ করা বড় কঠিন ব্যাপার; এই ভাবিয়া তাঁহারা অজ্ঞান লোকদিগের জন্য অমূর্ত্ত ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিলেন। সর্ব্বব্যাপককে একটা ব্যাপ্য ভাবে সন্নিবেশিত করিলেন। তাঁহাদের

লক্ষ্য ছিল যে যাহারা সূক্ষ্মধ্যানে অসমর্থ তাহাদের জন্যই এই পূর্ব্বসোপান প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু সেই সমস্ত কারুণিক-স্বভাব ঋষিরা বোধ হয় তৎকালে এইটুকু বিবেচনা করেন নাই যে, যে বস্তু অতি কঠোর সাধন-সাধ্য তাহাকে পাইবার জন্য কোনরূপ রাজকীয় পথ আবিষ্কৃত হইতে পারে না। তাঁহারাই কহিয়াছেন, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। কঠোর সাধনলভ্য পদার্থের জন্য অতি কঠোর পথ ব্যতীত অন্য কিছু সুগম পথ হইতে পারে না। এই পথে গমন অবশ্য কষ্টসাধ্য, কিন্তু তা বলিয়া কঠোরতার কড়াক্রান্তি বাদ দিলে চলে না। হও না তুমি অজ্ঞান, তা বলিয়া তুমি যে জ্ঞানলভ্য বস্তুকে জ্ঞান ছাড়িয়া যেন তেন প্রকারেণ লাভ করিবে ইহা হইতেই পারে না। ফলেও এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যদিও ঋষিরা অজ্ঞানের পক্ষে ইহা পূর্ব্বসোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু অজ্ঞানেরা এই সোপানেই চিরকাল দাঁড়াইয়া আছে। উত্থান তো দেখিতে পাই না। কিন্তু ঋষিদিগের করুণার পরিসীমা নাই। তাঁহারা যদিও অজ্ঞানদিগের জন্য জ্ঞানবিরোধী একটা অন্ধ পথ খুলিয়া দিয়াছেন তথাচ তাহার ভিতরে একটু অস্ফুট আলোকও রাখিয়াছেন কিন্তু মূর্ত্তির বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ চাকচিক্যে মোহিত লোকেরা তাহা দেখে কৈ।

ব্রহ্ম জ্ঞানশক্তিসমন্বিত ও নিরাকার নির্ব্বিকার,ঋষিরা তাহা সম্যক জানিতেন। মূর্ত্তিপূজায় যে অমূর্ত্ত ব্রহ্মের প্রকৃত পূজা হয় না, সর্ব্বব্যাপক পদার্থে পরিচ্ছিন্ন ভাব অর্পণ করা যে জ্ঞানবিরোধী, ইহাও বেশ বুঝিতেন। বুঝিয়াও যে মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তনা করেন তাহার তাৎকালিক হেতু ছিল। অজ্ঞান জ্ঞানের নাশ্য। তাঁহারা অজ্ঞানের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া মূর্ত্তিপূজার অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে সেই অজ্ঞাননাশক জ্ঞানবীজ রোপণ করিয়া গিয়াছেন। ইহাও তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে,বাহ্য মূর্ত্তির আকর্ষণ অধিক, প্রকৃত লক্ষ্য বস্তুকে তাহা বহুবিধ কল্পনা জল্পনা, কুহেলিকা এবং প্রহেলিকায় আচ্ছাদন করিয়া রাখে, সুতরাং অজ্ঞান মনুষ্য বাগুরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় চিরকালই এই মূর্ত্তিতেই আবদ্ধ থাকিবে। তাহার কোন কালেই আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্ভাবনা থাকিবে না। এই জন্য তাঁহারা এই মূর্ত্তিপূজার সহিত দেবীমাহাত্ম্য-প্রতিপাদক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। ইহাই মার্কণ্ডেয় চণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থখানি যেমন জ্ঞানাংশে তেমনি কাব্যাংশে আজও সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার প্রতিপাদ্য একটী আখ্যায়িকাচ্ছলে ব্রহ্ম-তত্ত্ব নিরূপণ। আখ্যায়িকাটী এই। একজন মুমুক্ষু বৈশ্য ও একজন বিষয়লুব্ধ রাজা এক ঋষির নিকট গমন করেন এবং আপনাদিগের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া কহেন এখন কি উপায়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তখন ঋষি উভয়কেই দেবীর আরাধনার উপদেশ দেন এবং প্রসঙ্গত তাঁহার উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন করেন। ফলত এই গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ। যাঁহারা বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক ঐ গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা উহার মধ্যে কুত্রাপি মূর্ত্তিপূজার কোনই পোষকতা পাইবেন না। যিনি অর্চনীয়া তিনি শক্তিরূপিণী। ঐ গ্রন্থে যথায় তাঁহার উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে তথায় গ্রন্থকার মহর্ষি জগ-

তের শক্তিসমষ্টিই যে তাঁহার মূর্ত্তি ইহাই বলিয়াছেন। ফলত তাহা প্রকৃত পক্ষে হস্তপদাদি অবয়বের সঙ্ঘাত নয়। উহা বিশ্বব্যাপিনী শক্তির প্রতিকৃতি মাত্র। ব্রহ্মাদি দেবতার শরীরজ তেজ হইতে ঐ দেবীর উৎপত্তি। ইহার অর্থ আর কিছুই নয় সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণ হইতে ঐ ব্যাপিকা শক্তির বিকাশ হইয়াছিল। এই জন্য শক্তি ত্রিগুণাত্মিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। এই আবির্ভূতা শক্তিকে গ্রন্থকার নারী রূপে কল্পনা করিয়াছেন।

অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজং।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥

ইহা ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রতিপোষক। যাঁহার কোনরূপ লিঙ্গ নাই তাঁহাতে এইরূপ লিঙ্গ নির্দ্দেশ করিবার হেতু লোকের প্রতি ঋষিদিগের করুণা। অর্থাৎ সাধকেরা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে পিতা বা মাতা উভয় প্রকার ভাবেই ঈশ্বরকে ভাবিতে পারেন—ভাবা উচিতও।

প্রকৃত কথা এই যে, জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার ঐ শক্তির আয়ত্ত এই জন্য গুণত্রয় বা ব্রহ্মাদি হইতে উহাঁর মুখাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি কীর্ত্তন করিয়া একটি ছবি প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে বিশ্বব্যাপক প্রকৃতিতে যা কিছু কমনীয় এবং যা কিছু ভীষণতা আছে এই কল্পিত স্ত্রীমূর্ত্তিতে তাহা আরোপণ করিয়া ইহাই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, জগতের যত কিছু ভীম ও কান্ত ভাব দেখিতেছ তাহা এই শক্তিরই বিকাশ। গ্রন্থকার ঋষি দেবীমাহাত্ম্যে এইরূপে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির আবির্ভাব কীর্ত্তন করিয়া পরে অসুরসংহাররূপ রূপক আশ্রয় করিয়া কহিয়াছেন বিশ্বসৃষ্টিতে যাহা অমঙ্গল এই শক্তিপ্রভাবে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই শক্তি নিত্য মঙ্গলময়ী। অসুর নাশ অর্থাৎ অমঙ্গল দুর করিয়া দেবতার হর্ষোৎপাদন কিনা জগতে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা এই শক্তিযোগেই নিরন্তর সাধিত হইতেছে। দেবীমাহাত্ম্যে কথিত অসুরসংগ্রামের ইহাই প্রকৃত অর্থ। এই শক্তিরূপিণীর অর্চনা কর তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। মুক্তি কামনা থাকে ইহাঁর অর্চনায় তাহা লাভ হয়। বিষয়বাসনা থাকে এই শক্তির সেবায় তাহার সিদ্ধি হয়। কিন্তু স্থূল ভোগ কামনা করা জ্ঞানের অনুমোদিত নয়। এইরূপে ঋষি গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন। ইহার প্রথমাংশে অর্থাৎ যেখানে শক্তির আবির্ভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে সেখানে মূর্ত্তির কোনই কথা নাই কিন্তু উপসংহারে যথায় বৈশ্য ও রাজা নদীপুলিনে গিয়া আরাধনার্থ বসিলেন তথায় মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির কথা আছে। ঐ অংশটুকু যে পরবর্ত্তী কালের যোজনা সমগ্র গ্রন্থ আলোচনা করিলে তাহা সুস্পষ্ট বোধ হয়। কিন্তু যেরূপ গূঢ়ভাবে এবং কবিত্বের গর্ভে এই জ্ঞানবীজ নিহিত হইয়াছে তাহা স্থূলদর্শীর বড় একটা বোধগম্য হইবে না। সে সম্মুখে দেখিবে একটী স্থূল মূর্ত্তি এবং মাহাত্ম্য পাঠেও বুঝিবে তাহাই। এই দোষ নিরাকরণের জন্য পরবর্ত্তী ঋষিরা এই দেবীমাহাত্ম্যে দেবীসুক্ত নামে কএকটী ঋকমন্ত্র যোজনা করিয়া দিয়াছেন। নিয়ম এই যে, অগ্রে দেবীসূক্ত পাঠ করিয়া পরে আদ্যোপান্ত দেবীমাহাত্ম্য পড়িতে হইবে। দেবীপ্রতিপাদক এই জন্য ইহার নাম দেবীসূক্ত। অগ্রে এই ঋকমন্ত্র পাঠ করিবার বিশেষ অভিপ্রায় এই যে দেবীমাহাত্ম্য মধ্যে যদি কাহারও প্রকৃত একটা মূর্ত্তি ভ্রান্তি জন্মে ইহা দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ রূপে নিরাস হইবে। ফলত দেবীমাহাত্ম্যে ব্রহ্মতত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম

একমেবাদ্বিতীয়ং। তাই শক্তিরূপিণী শুম্ভকে ক্রোধভরে কহিয়াছিলেন, একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা। সুতরাং ইহা দ্বারা সাধককে বুঝিতে হইবে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনাতেই মুক্তি। এবং তাহাই দেবীমাহাত্ম্যের প্রতিপাদ্য।

এখন কথা এই, শক্তি বলিতে একটা অন্ধশক্তি বা জড়শক্তি বুঝায়। জ্ঞানশক্তিসমন্বিত ব্রহ্মের পূজা কেবল শক্তিপূজায় সম্ভবে না। সুতরাং জড়শক্তির উপাসনায় ফল কি। কিন্তু এই শক্তি যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ইহা যে ব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তি দেবী· সূক্তে তাহা অতিসুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ঐ ঋক্‌মন্ত্রে একস্থলে আছে,অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী ইত্যাদি। এইটী শক্তির উক্তি। কথিত হইয়াছে অহং চিকিতুষী, স্বস্বরূপেণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতবতী। আমি স্বস্বরূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিয়াছি। অর্থাৎ আমার স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। পরে কথিত হইয়াছে,

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি। অহং স্বয়মেব ইদং ব্রহ্মাত্মকং বস্তু, ঈদৃক্‌বস্ত্বাত্মিকা অহং যং যং কাময়ে ইত্যাদি।

ইহার অর্থ আমি স্বয়ংই এই ব্রহ্মাত্মক বস্তু, দেব মনুষ্য আমার সেবা করে। আমি যাহাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিয়া থাকি। তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং সুমেধাম্‌। আমি স্রষ্টা ঋষিকে অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী এবং শোভন প্রজ্ঞাযুক্ত করি। সূক্তের এই সমস্ত প্রমাণে নির্ণীত হয় শক্তি ব্রহ্ম-নির্ব্বিশেষে দৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম না হইলে এই সমস্ত বাক্য কাহাতে প্রযুক্ত হইতে পরে। আরও, শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ এই প্রবচন অনুসারে শক্তি বলিতে শাস্ত্রানুসারে কেবল জড়শক্তি বুঝায় না তাহা ব্রহ্মাভেদে ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি বলিয়া বুঝিতে হয়। ঐ সূক্তের আর একটা স্থলে আছে অহং জনায় সমদং কৃণোমি। আমি লোকরক্ষার্থ সংগ্রাম করিয়া থাকি। অর্থাৎ বিশ্বে যা কিছু অমঙ্গল আমি তাহা দূর করি।

ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি যঃ শৃণোতি ইত্যাদি।

লোকের অসন দর্শন প্রার্থনাদি সমস্ত ক্রিয়া আমা দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ফলত দেবীমাহাত্ম্য এই দেবীসূক্তেরই প্রতিচ্ছায়া। এই সূক্তে কেবলই ব্রহ্মজ্ঞান, কুত্রাপি মূর্ত্তির কথা নাই। এই বেদবোধিত জ্ঞান কাব্যাকারে দেবীমাহাত্ম্যে রচিত হইয়াছে। কবির রচনা পাঠে অল্পবুদ্ধিদিগের যদিও মূর্ত্তিভ্রান্তি হয় দেবীসূক্ত পাঠে তাহার সম্পূর্ণ অপনোদন হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য মাহাত্ম্য পাঠের পূর্ব্বে এই কএকটী বেদমন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা আছে। এখন বেশ বুঝা গেল অমূর্ত্ত ব্রহ্মের যে মূর্ত্তি নাই ঋষিরা তাহা সুস্পষ্টই দেখাইয়াছেন এবং মূর্ত্তিপূজার বিরোধেও অনেক কথা বলিয়াছেন। তোমার উপাস্য জ্ঞানশক্তিসমন্বিত ব্রহ্ম। অমন্তবো মান্ত উপক্ষীয়ন্তে, এই শক্তিরূপিণী কহিতেছেন আমাকে অন্তর্যামী রূপে না জানিলে মহাবিনাশ। প্রকৃত ব্রহ্মের উপাসনা কর নচেৎ তোমার মহাবিনাশ। মূর্ত্তিপূজায় সে মহাবিনাশ হইতে পরিত্রাণ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সারদীয় মহোৎসবে ঋষিদিগের এই গূঢ় অভিপ্রায় কিছু যে রক্ষিত হইতেছে তাহা বোধ হয় না। এখন অজ্ঞান ব্যক্তিরা কেবল নয়, কিন্তু জ্ঞানবান্ ব্যক্তি-

রাও মৃৎপাষাণ মূর্ত্তি সম্মুখে স্থাপন না করিলে পূজা সফল জ্ঞান করেন না; মৃৎপাষাণ ছাড়িয়া ঋষিনির্দ্দিষ্ট জ্ঞানপথের অনুবর্ত্তী হ'ন না। যখন দেখিতেছি মূর্ত্তিই জ্ঞানকে আবরণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়, তখন উহা এককালে ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। ফলত মূর্ত্তিপূজায় প্রকৃত আত্মোন্নতি হয় না। নিরন্তর জড়সেবায় আত্মা ক্রমশঃ জড়াকার ধারণ করে। সুতরাং মূর্ত্তিপূজায় মুক্তি সুদূরপরাহত। ব্রহ্মচর্য্য শমদমাদিসাধন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানময় ব্রহ্মে মনঃসমাধান ব্যতীত অন্তঃকরণশুদ্ধি ও মুক্তি হয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কঠোর সাধনসাধ্য বস্তুর জন্য কঠোরতা চাই, তাহার একটু এ-দিক ও-দিক করিলে চলিবে না। শম দমাদি সাধানরূপ কঠোর ব্রতে অবস্থিত হও এবং দেবীমাহাত্ম্য ও দেবীসূক্তপ্রদর্শিত প্রকৃত গম্য-স্থানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ কর নিশ্চয়ই ঋষিদিগের আশীর্ব্বাদ তোমাতে ফলিত হইবে, তুমি কল্পিত মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অমূর্ত্ত জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অর্চ্চনায় মনুষ্যত্ব পাইবে।

দুর্গোৎসবে কোন্ অংশ উপাদেয় এবং কোন্ অংশ ত্যজ্য আমরা এতক্ষণ তাহা বিবৃত করিলাম। যদিও জ্ঞানবিরোধি বলিয়া আমরা মূর্ত্তিপূজা অস্বীকার করি কিন্তু এই উৎসবে জনসমাজের যা কিছু মঙ্গল সাধিত হয় সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকি। বিজয়ার দিনে যে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হন, অন্ততঃ ঐ এক দিনের জন্য যে অনেকে বদ্ধমূল শত্রুতাকেও উপেক্ষা করিয়া থাকেন ইহা নিশ্চয়ই দেবভাব। এতদ্ব্যতীত এই দুর্ভিক্ষের দিনে অনেকেই দীন দুঃখীদিগকে অন্ন বস্ত্রাদি দিয়া পরিতুষ্ট করিয়াছেন। অনেকেই দয়াপরতন্ত্র হইয়া কএকদিনের জন্যও যে অনেককে নানারূপে সুখী করিয়াছেন ইহা ভাবিলেও মনে অপার আনন্দোদ্রেক হয়। দয়াই ধর্ম্মপথের পরম সহায়। দয়া ব্যতীত ধর্ম্ম দাঁড়াইতেই পারে না। দুর্গোৎসবে অনেক স্থলেই যে দয়াবৃত্তির যথোচিত চরিতার্থতা সাধিত হয় তাহা নিঃসংশয়। আরও এই উৎসবের প্রভাবে দেশ মধ্যে শিল্প সাহিত্য বাণিজ্যাদি সুরক্ষিত হইতেছে ইহাও অস্বীকার করি না। কিন্তু যাঁহারা সমাজের অধিনায়ক, যাঁহাদের নেতৃত্বে এদেশের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে সেই সমস্ত শীর্ষস্থানীয় জ্ঞানবান ব্রাহ্মণেরা যদি এই মূর্ত্তিপূজার পরিবর্ত্তে, তাহার প্রকৃত প্রতিপাদ্য অমূর্ত্ত ব্রহ্মের উপাসনা সাধারণকে বুঝাইয়া দেন তাহা হইলেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ, নচেৎ জড়োপাসনায় ক্রমেই লোকের অধোগতি।

পত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কি প্রকার পদার্থ জ্ঞাত হইলে জীব জ্ঞানী হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন তদ্বিষয়ে বেদ বলিতেছেন পূর্ব্বোক্তলক্ষণযুক্ত পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইলেই মনুষ্য যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারে, অন্যথা নহে, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সকলের প্রকাশক, অবিদ্যা অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানাদি হইতে যিনি পৃথক এমন পরমাত্মাকে আমি আপন ইষ্টদেব করিয়া জানি এবং সেই ইষ্টদেবকে জানিতে না পারিলে কেহই যথার্থ জ্ঞানবান হইতে পারেন না। সেই পরমাত্মাকে উপাসনা দ্বারা জানিয়াই সাধু

মহাত্মা ও আপ্ত পুরুষেরা সকলপ্রকার ক্লেশ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষপ্রাপ্ত হন। এই উপাসনা ব্যতীত সেই পরমাত্মার প্রাপ্তির অন্য উপায় বা পথ নাই। সেই পরমাত্মাকে অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা বেদাধ্যয়ন দ্বারা অথবা মেধা অর্থাৎ গ্রন্থার্থ ধারণ শক্তি দ্বারা কিম্বা বহু শ্রবণ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। আত্মদর্শনার্থ যে সাধক "যমেব" সেই পরমাত্মায় মন বচন ও কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া (বৃণুতে) তাঁহার স্তুতি প্রার্থনা, বিচার ও ধ্যান করেন (তেন লভ্যঃ) তিনিই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয়েন অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়েন; এবং তাঁহার নিকটেই পরমাত্মা স্বকীয় তনু অর্থাৎ স্বস্বরূপ প্রকাশ করেন। বলিতে কি কঠোপনিষদের এই একমন্ত্রই ব্রাহ্মধর্ম্মের তৃতীয় বীজের সত্যতার জাজ্জল্যমান প্রমাণ।

মুমুক্ষু ব্যক্তি অর্থাৎ মুক্তিপ্রার্থনাকারী ব্যক্তির পক্ষে কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা আবশ্যক এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিতেছেন যে, মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে সাধুসঙ্গ, নির্ম্মমতা ও ঈশ্বরভক্তি বা ঈশ্বরোপাসনায় সদা নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য।

পরমযোগী পতঞ্জলি ঋষি বলেন যে ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতি বিশিষ্ট রূপ ভক্তি সর্ব্বাপেক্ষা তল্লাভের সুগম উপায়। এমন কি কেবলমাত্র উপায়। অর্থাৎ অপর যে সকল উপায় আছে তাহা এই উপায়ের অঙ্গ মাত্র। পরমাত্মার ধ্যান দ্বারা জীবের সমাধি লাভ হয়। পরম পিতা পরমশ্বরের প্রতি পরম প্রীতি ও ভক্তি উচ্ছলিত করাকেই ঈশ্বরোপাসনা বলা যায়। সকল কার্য্যেই সাধক কায়মনোবাক্যে আপনাকে ঈশ্বরাধীন মনে করিবেন। তিনি যখন যে কার্য্য করিবেন তৎফলের প্রতি অনুসন্ধান বা দৃক্‌পাৎ না করিয়া সেই পরমগুরু পরমাত্মাকে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের অনুরোধে সমস্ত জ্ঞানানুকূল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ও অকপট ও পুলকিত চিত্তে সর্ব্বদাই তাঁহারই ধ্যান ও চিন্তনে মগ্ন থাকিবেন। যখন যোগীর মন ঈশ্বর ছাড়া অপর কোন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হয় তখনই যোগী পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মায় বিরাজ করেন। ঈশ্বরোপাসনাই যে একমাত্র ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। দেখুন আমাদিগের মন অবিদ্যাবশতই চারিদিকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের জন্য লালায়িত হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়। যখন আমরা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের কারণ স্বরূপ পরমাত্মার সন্নিকটস্থ হই, যখন আমরা সকলের আধার স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হই তখন আর আমাদিগের মন কোন বাহ্য পদার্থের জন্য উদ্বিগ্ন হয় না। এই জন্যই যোগ দর্শনে লিখিত আছে "বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ"। অর্থাৎ যোগী যখন সমাধি প্রভাবে বিশেষ দর্শনে সমর্থ হন অর্থাৎ যখন অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের ও পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হন তখন আর তাহার কোন বাহ্য বিষয় জানিবার বা প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে না এবং ইচ্ছা না থাকিলেই ভাবনা নিবৃত্তি হইয়া চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। এবং চিত্তের বৃত্তি নিরোধ হইলেই চিত্ত যে বাহিরের বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইত তাহার কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়া অন্তরতম পরমাত্মায় মগ্ন হয়।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, ভাদ্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৫৮৪৶০
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬৩১৶০
সমষ্টি	...	৩২১৫।৵০
ব্যয়	..	৪৪৮৵৯
স্থিত	...	২৭৬৭৶৩

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

দফে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত দুই কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ২০০০৲

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সোলা পোষ্ট বিল এক কেতা ১৩৮৵৩

২১৩৮৵৩

২৬৩৮৵৩

হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু ৭৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ১২২৴০

২৭৬৭৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ২৩৩৮৵৩

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০০৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২১৩৮৵৩

২৩৩৮৵৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ২৭৷০

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা ১২৲

৺ বাবু জয়গোপাল সেন, ঐ ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসাদ ঘোষ, ঐ ২৷০

" " জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ ৩৲

" " বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ ৩৲

" " বিপিনবিহারী সরকার, ঐ ৩৲

" " মথুরানাথ রায়, ঐ ৩৲

২৭৷০

পুস্তকালয়	...		১৩।৴০
যন্ত্রালয়	...	...	১৯৯৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন			২॥০
কমিশন	...	...	৩৶৯
সমষ্টি			২৫৮৪৶০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৯৬॥৴৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৪৸৶০
পুস্তকালয়	...	২০৸৵৯
যন্ত্রালয়	...	৯৫৸৵৬
গচ্ছিত	...	৯৸৯
সমষ্টি	...	৪৪৮৵৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৯ কার্ত্তিক রবিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের চতুশ্চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক
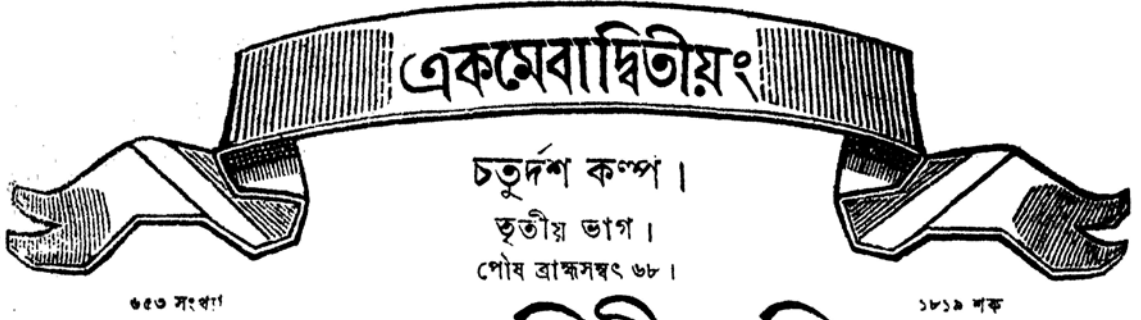
ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৮১৯ শক। ২৮এ আশ্বিন বুধবার।

সন্তোষ।

একদা শরৎকাল সমাগত হইলে, আমি প্রাতঃকালীন পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলাম। সম্মুখেই এক বৃহৎ প্রান্তর ও সরোবর ছিল। দেখিলাম নবোদিত সূর্য্যকিরণে পদ্ম সকল সরোবরে শোভা পাইতেছে। আমি প্রান্তর উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলাম। তথায় যাইয়া দেখি কোন দুই জন ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি পরস্পর ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন করিতেছে। তন্মধ্যে এক জন কহিল, আমি বহুকাল আমার ধর্ম্মসাধন করিয়া পরিশেষে আমার দেবতার নিকট এক অপূর্ব্ব রত্নমণি পুরস্কারস্বরূপ পাইয়াছি। ইহার ভিতর এক তেজোময় পদার্থ আছে, যাহার বলে ইহা অদ্ভুত শক্তি ধারণ করে। ইহা যে দ্রব্যের নিকটে থাকে, সে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা সূর্য্যে জ্যোতি ও হীরকে নির্ম্মল প্রভা সঞ্চিত করে। ইহা সকল ধাতুর তেজের কারণ, এবং লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে। ইহা ধূমকে অগ্নিশিখায়—অগ্নিশিখাকে আলোকে, আলোককে মহিমান্বিত জ্যোতিতে পরিণত করিতে পারে। ইহা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহার শরীর হইতে ব্যথা, ও মন হইতে দুর্ভাবনা ও বিষাদ দূর হইয়া যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহা যে স্থানে থাকে, তাহাকে স্বর্গের সমান করিয়া তুলে। এই সকল কথা শুনিয়া প্রথমে কিছু বিস্মিত হইলাম। পরে বুঝিলাম, বক্তা ঠিকই বলিতেছে। তাহার কথিত বিষয় রূপকের ছলে বলিতেছে। বাস্তবিকই এই মণির সহিত, সন্তোষ-ধর্ম্মের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। যদিও ইহা সত্য সত্য ধন ঐশ্বর্য্য আনিয়া দিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহা মন হইতে ধনের উৎকট বাসনা দূরীভূত করিয়া ধনপ্রাপ্তির অনুরূপ ফল বা তৃপ্তি দান করিয়া থাকে। ইহা মনুষ্যকে সকল প্রকার কষ্টে সহনশীল করিতে পারে। সন্তোষপরায়ণের মনে যে একটি

বিশেষ শক্তি—কোমল ভাব আছে, তাহা তিনি অপরের আত্মায় বিদ্যুৎ-গতিতে প্রবিষ্ট করিয়া তাহাকে বশীভূত করিতে পারেন। ঈশ্বর যে অবস্থায় তাঁহাকে রাখিয়াছেন, তাহার উপর তাঁহার কিছুতেই বিরাগ জন্মে না। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর যে ভক্তি তাহা দুর্ভাগ্যকালেও বিচলিত হয় না। তিনি কখনও অকৃতজ্ঞ হয়েন না। তিনি প্রতিবেশীর কুলশীল সুখসৌভাগ্য দেখিয়া, লোভ বা পাপ-দূষিত কামনার বশীভূত হয়েন না। সন্তোষ তাঁহার কথোপকথনে মধুরত্ব ও চিন্তায় স্থিরভাব সমুৎপাদন করে।

সন্তোষ উপার্জ্জনের যে যে উপায় আছে, তন্মধ্যে আমি এথানে দুইটির উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ মনুষ্যের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, যাহা তাঁহার প্রকৃত অভাব, তাহা অপেক্ষা তাঁহার কত অধিক আছে। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বর্ত্তমানে যত অসুখী তাহা হইতে আরো কত অধিকতর অসুখী হইলেও হইতে পারিতেন। প্রথম প্রস্তাবটি ধনীদিগের ও দ্বিতীয়টি দুঃস্থদিগের বিশেষ বিবেচনার বিষয়। কোন এক সন্তোষপরায়ণ ধনী ব্যক্তির চারিখানি ক্ষেত্র ছিল, কোন গতিকে তিনি তাহার মধ্য হইতে এক-খানিতে বঞ্চিত হইলেন। তজ্জন্য এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, আমার ত এখনো তিন খণ্ড ক্ষেত্র আছে, তোমার ত একখণ্ড বই নাই। আমার বরং তোমার জন্য দুঃখ করা উচিত।

নির্ব্বোধেরা যাহা গিয়াছে, তাহার জন্য দুঃখ করে, যাহা আছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। তাহারা আপনাদের অপেক্ষা অধিকতর ধনীদিগের উপর দৃষ্টি স্থির রাখে, কিন্তু অধিকতর দুঃস্থদিগের অবস্থার প্রতি চাহিয়া দেখে না। জীবনের প্রকৃত সুখ সচ্ছন্দতা যৎসামান্য উপকরণের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু মনুষ্যের কেমন স্বভাব, যে, সে কেবল উচ্চ হইতে উচ্চ অবস্থার প্রতি চক্ষুঃ রাখিতে ভালবাসে, এবং কি প্রকারে আপনা হইতে ধনে মানে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিকে পরাস্ত করিবে, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। এরূপে দেখিতে গেলে, যাহার নিজ অভাব পূরণ অপেক্ষা অধিকতর ধন না থাকে তাহাকে আর ধনী বলা যায় না।

সভ্যতাভিমানী ধনীদিগের অপেক্ষা বরং মধ্যবিত্ত লোকদিগকে এক রূপ ধনী বলা যাইতে পারে। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেকেই আপনার অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া চলে না। তাহাদের এত উদ্বৃত্ত হয়, যে তাহা লইয়া তাহারা কি করিবে, বরং ভাবিয়াই অস্থির। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা একরূপ সমুজ্জ্বল দারিদ্র্যের মধ্যেই থাকে। তাহাদের সকল সময়েই অভাব বোধ হয়। তাহারা জীবনের প্রকৃত সুখে সন্তুষ্ট না হইয়া সুখের ছায়ায় আসক্ত হইয়া জিগীসার বশবর্ত্তী হয়। জ্ঞানীগণ সকল সময়েই তাহাদের এই বৃথা ক্রীড়া দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদের বাসনা খর্ব্ব করিয়া সেই সকল গূঢ় আনন্দ ভোগ করেন, যাহা অন্যে চিরদিনই অন্বেষণ করিয়াই বেড়ায়। প্রকৃত কথা এই, কাল্পনিক সুখের অনুসরণ যার পর নাই নিন্দনীয়। ইহা মহৎ মহৎ বিপদের উৎপত্তিস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহার জন্যই ধরণীস্থ প্রধান প্রধান জাতিই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যের বিষয় সম্পত্তি যতই কেন অধিক

হউক না, বুঝিয়া চলিতে না পারিলে—অবস্থাচক্রের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে না শিখিলে তিনি চিরকালই দরিদ্র। সংক্ষেপে বলিতে গেলে সন্তোষই ঐশ্বর্য্য ও বিলাসই দারিদ্র্যের অনুরূপ। সন্তোষই স্বাভাবিক অর্থ—বিলাসই কৃত্রিম দারিদ্র্য। যাহারা সর্ব্বদা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুখসামগ্রীতে আসক্ত ও কিছুতেই আপনাদের বাসনাকে খর্ব্ব করিতে চাহে না, তাহাদিগকে আমি কোন এক জ্ঞানীর কথায় বলি যে, যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুখের আশায় লালায়িত হয়, সে যেমন দুশ্চিন্তার অধীন হয়, এমন আর কেহ হয় না। সন্তোষ লাভের দ্বিতীয় উপায় আমি পুনর্ব্বার উল্লেখ করিতেছি, প্রত্যেকেরই ভাবা উচিত যে তাঁর বর্ত্তমান অবস্থা হইতেও অধিকতর শোচনীয় অবস্থা ঘটিলেও ঘটিতে পারিত। বিশেষতঃ দুঃখী ও বিপন্ন লোক আপনার দুঃখের সহিত অন্যের দুঃখের তারতম্য করিলে অনেক সান্ত্বনা পাইতে পারেন। দৃষ্টান্তও রহিয়াছে। একজন ওলন্দাজ জাহাজের সর্ব্বোচ্চ মাস্তুর হইতে পতিত হইয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাতে তিনি নিকটস্থ লোকদিগকে বলিলেন, ঈশ্বরের করুণা বলিতে হয়, যে আমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায় নাই।

এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানবেত্তা ভোজ উপলক্ষে তাঁহার বন্ধু বান্ধবকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সকলে আহারাদি করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার স্ত্রী ভোজনকক্ষে ক্রোধান্বিত হইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সম্মুখস্থ টেবিল সজোরে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি কহিলেন, সকলেরই দুঃখ দুর্ভাগ্য আছে, আমিত সুখী, যে আমার ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ করিবার কারণ নাই। এক জন ডাক্তার বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার পাথরী রোগ হয় নাই। পরে যখন তাঁহার পাথরী রোগ হইল, তখন বলিলেন, ইহাও সৌভাগ্য বলিতে হইবে, যে বাত ও পাথরী উভয়ে এক কালে উপস্থিত হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় যাহাতে আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, তাহার জন্য পুরাকালের অনেক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে অসন্তোষ কেবল দুঃখই বৃদ্ধি করে, অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। অপরে বলেন দুঃখ দুর্ভাগ্য অদৃষ্ট নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে, দেবতারাও ইহার অধীন। আবার অনেকে গাম্ভীর্য্যের সহিত বলেন, তোমার দুঃখী হওয়া অনিবার্য্য, যে হেতু তাহা না হইলে বিশ্ব সংসারে একটা সামঞ্জস্য থাকে না, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। এই প্রকার যুক্তি ও প্রবোধ বাক্য শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা না দিয়া বরং নিস্তব্ধই করিয়া তুলে। এই সকল যুক্তি দ্বারা অসন্তোষকে দূর করা যায় না। তৎসমুদায় সান্ত্বনার স্থলে বরং নিরাশাই আনিয়া দেয়।

একদা অগস্টস্ সিজার তাঁহার প্রিয়জন-বিয়োগ-বেদনায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন। তখন তাঁহার কোন এক বন্ধু বলিলেন, "কেন মিছে ক্রন্দন কর, তুমিত আর তাহাকে ফিরিয়া পাইবে না।" সিজার বলিলেন—"সেই জন্যইত কাঁদিতেছি।" দুঃখ দুর্দ্দিনে অনেকেই আমাদিগকে ঐরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহাতে আমাদের দুঃখ দূরও হয় না, অসন্তোষও যায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এ বিষয়ে মধুর উপদেশ দান করেন। তিনি

বলেন, এ লোকে তোমার সকল আশা আবদ্ধ করিয়া রাখিও না। পরলোকে বিরহ বেদনা থাকিবে না। প্রিয়জনের মিলন আশা সেখানে। সেখানে সকল দুঃখের অবসান হইবে। এখানে কেবল তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া থাক। তাহাতেই শান্তি-সুখ মিলিবে। আর বিপদকালে ব্যথিত না হইয়া ঈশ্বরের নিয়মানুসারে কার্য্যোপায়ে তৎপর থাক। অপ্রতিবিধেয় বিষয়ে ধৈর্য্য ধারণ কর। আপনার অবস্থাকে ভগবানের চক্ষের উপর উন্নত করিতে চেষ্টা কর। তিনি তোমায় সাহায্য করিবেন। তিনি না দিলে কেহ কিছু করিতে পারে না। গৃহ গ্রাসাচ্ছাদন প্রভৃতি যাহা যাহা সংসারে প্রয়োজন, তাহা দুর্লভ মনে করিও না। ন্যায়ানুসারে তাহা উপার্জ্জন কর। প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় লাভের জন্য দুরাকাঙ্ক্ষ হইও না। সততঃ সেই স্পর্শমণিকে হৃদয়ে রক্ষা কর। সকল প্রকার দুঃখ দারিদ্র্য দূর হইয়া যাইবে।

হে দেব! যাহাতে আমরা সুখে দুঃখে তোমাকে না ভুলি,তোমার সন্তোষধর্ম্ম লাভ করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে এপ্রার শক্তি দান কর।

"ডাকে এ কুটীরবাসী অতিশয় সযতনে।
মুক্ত কর মলিন মন, অশ্রুবারি নিক্ষেপণে॥
তুমি আমার স্পর্শমণি,আঁধার ঘরের আলো।
সুখ শান্তি সবই তুমি শুভ্রালোক এ জীবনে॥"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তভাষ্য--ব্রহ্মসূত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সিদ্ধান্ত—শৈশবের জ্ঞানসঞ্চারক্রম ঐরূপ হইলেও, শব্দের বস্তুবোধকতা শক্তি যে কেবল ক্রিয়ান্বিত পদার্থেই পরিসমাপ্ত, তাহা নহে। সিদ্ধ পদার্থেও ক্রিয়াস্বয়বর্জ্জিত শব্দের বোধকতা শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। "তোমার পুত্র সুশীল" এই শব্দ শ্রবণের পর শ্রোতার মুখে হর্ষ চিহ্ন উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এবং তদ্দ্বারা বুঝিয়া লও যে, স্থিত বস্তুর বোধক অনন্বিতক্রিয় শব্দও স্থিত বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে সক্ষম। অতএব, জৈমিনির উক্তবিধ সিদ্ধান্ত ধর্ম্ম বিষয়েই ব্যবস্থাপিত, ব্রহ্মবিষয়ে নহে। অর্থাৎ জৈমিনি মুনি মনুষ্যদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারী করিবার অভিপ্রায়ে বেদপূর্ব্বভাগের অর্থাৎ বিধিনিষেধ ঘটিত কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদরাশির মীমাংসা করিয়া ধর্ম্ম ব্যবস্থাপন করিয়াছেন, উত্তরভাগের অর্থাৎ উপনিষদ ভাগের মীমাংসা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যবস্থাপন করেন নাই। জৈমিনির মীমাংসায় ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ার্থ উত্তরভাগ (উপনিষদ) গতার্থ না হওয়ায় বাদরায়ণ মুনি কর্ত্তৃক তাহা আরম্ভযোগ্য হইয়াছে। প্রদর্শিত অধিকরণটী রামানুজের ভাষ্যে স্পষ্টাকারে বা মুখ্যরূপে অভিহিত হইয়াছে। অন্যান্য অবান্তর অধিকরণ বা খণ্ড খণ্ড বিচার তিনি পরমত খণ্ডন প্রসঙ্গে সমাধা করিয়াছেন। কীদৃশ মনুষ্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মুখ্যাধিকারী? বেদান্তের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বস্তু কি? বেদান্তের সহিত ব্রহ্মতত্ত্বের সম্বন্ধ কিরূপ? ব্রহ্মজ্ঞান কি এবং তাহার ফলই বা কি? এই চার অনুবন্ধ (বেদান্ত বিচার-প্রবৃত্তির প্রয়োজক কারণ) নির্ণয় উপলক্ষ্যে রামানুজ স্বামীকে শঙ্কর ভাষ্যোক্ত পূর্ব্বপক্ষগুলিকে সিদ্ধান্ত পক্ষে গ্রহণ করিতে দেখা যায়। যথা—

১। যে ব্যক্তি জৈমিনিকৃত কর্ম্মমীমাংসায় ব্যুৎপন্ন, সেই ব্যক্তিই বাদরায়ণ

কৃত ব্রহ্মমীমাংসার মুখ্যাধিকারী।” ইহা শঙ্করের পূর্ব্বপক্ষ। “সাধন চতুষ্টয় যুক্ত ব্যক্তিই বেদান্ত বিচারের মুখ্যাধিকারী, ইহা শঙ্করের সিদ্ধান্ত পক্ষ।

“সাধনচতুষ্টয়যুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মমীমাংসার উত্তমাধিকারী” ইহা রামানুজের পূর্ব্ব পক্ষ। “কর্ম্মমীমাংসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মমীমাংসায় অধিকারী” ইহা রামানুজের সিদ্ধান্ত পক্ষ।

২। “ব্রহ্ম ও জীব পরমার্থত বিভিন্ন” ইহা শঙ্করের পূর্ব্বপক্ষ। “ব্রহ্ম ও জীব পরমার্থত অভিন্ন” ইহা শঙ্করের সিদ্ধান্ত পক্ষ।

“ব্রহ্ম ও জীব পরমার্থতঃ অভিন্ন” ইহা রামানুজের পূর্ব্বপক্ষ। “ব্রহ্ম ও জীব বস্তুত বিভিন্ন” ইহা রামানুজের সিদ্ধান্ত পক্ষ।

৩। “ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মাত্র অজ্ঞান নিবৃত্তি” ইহা শঙ্করের সিদ্ধান্তপক্ষ এবং ব্রহ্মের সমান হওয়া তাঁহার পূর্ব্ব পক্ষ।

“ব্রহ্মজ্ঞানের ফল অজ্ঞান নিবৃত্তি” ইহা রামানুজের পূর্ব্বপক্ষ এবং ব্রহ্মসমান হওয়া” রামানুজের সিদ্ধান্ত পক্ষ।

৪। সম্বন্ধ—প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক এ অংশ উভয় মতে সমান।

এক অথ শব্দের দ্বারা ঐরূপ আরও অনেক বিচার উঠিয়াছে। তন্মধ্যে শঙ্করের অন্যতম সিদ্ধান্ত পূর্ব্বমীমাংসায় বিষয়, অধিকারী, ফল, সমস্তই ব্রহ্ম মীমাংসার বিষয়, অধিকারী, ও ফল হইতে অত্যন্ত পৃথক্। সে জন্য কর্ম্মমীমাংসার সহিত ব্রহ্মমীমাংসার ক্রমসম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বাপরীভাব নাই। পূর্ব্বাপরীভাব দূরে থাকুক, অধিকন্তু বাধ্যবাধক ভাব আছে। এই স্থানে রামানুজের সিদ্ধান্ত—পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা একই শাস্ত্র, পরন্তু তদ্দ্বারা ক্রমসম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বাপরীভাব আছে। আগে কর্ম্মমীমাংসায় ব্যুৎপন্ন হওয়া, পরে ব্রহ্মমীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্ব ও উত্তর উভয় মীমাংসার ফল বিভিন্ন বটে, পরন্তু তাহা অধিকারী ক্রমের ভেদ অনুসারে। অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মবিজ্ঞান জন্মে না বলিয়া আগে ধর্ম্মমীমাংসার প্রয়োজন, পশ্চাৎ ব্রহ্মমীমাংসার আয়োজন। এইরূপ অধিকারক্রম অনুসারেই ফলভেদ দর্শনের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া উভয় মীমাংসারই লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান, ইহা সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। ইত্যাদি।

যেমন অথ শব্দের অর্থনির্ণয়ে নানা বিচার, তেমনি, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা শব্দের নির্ণয়েও নানা বিচার উত্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্ম জ্ঞান সন্ প্রত্যয়ের অর্থ ইচ্ছা। মুমুক্ষু ব্রহ্মজ্ঞান ইচ্ছা করিবেন, এইরূপ অক্ষরার্থ প্রতীতির পরে এইরূপ মর্ম্মার্থ প্রতীতি হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তির প্রধান উপায়। ব্রহ্মজ্ঞান মুক্তির উপায়, এ অংশে কাহারও মতভেদ নাই। কিরূপ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান? তাহা সূত্রে লিখিত না থাকায় সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে শঙ্করের সিদ্ধান্ত—তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য শ্রবণজনিত অনির্ব্বিন্ন ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তির নাম ব্রহ্মজ্ঞান, তদুদয়ে অজ্ঞানের পলায়ন ও স্বস্বরূপপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ। বার বার মহাবাক্য শ্রবণ (বিচার) করিলেও যদি পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ অসম্ভব বোধের অথবা বিপর্য্যয়-বোধের বাধায় অখণ্ড বা নির্বিশেষ ব্রহ্মাদ্বৈত বুদ্ধি উদিত না হয় তাহা হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়। মনন নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতিবন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবেক, প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই অখণ্ড ব্রহ্মাকারাকারিতা

চিত্রবৃত্তি উদিত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত নাহংব্রহ্ম এই অনাদি অজ্ঞান বিদূরিত করিবেক।

শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত রামানুজের রুচিকর হয় নাই। রামানুজ ঐ সিদ্ধান্তকে পূর্ব্ব পক্ষে স্থাপন করিয়া "বাক্যজন্য জ্ঞান পরোক্ষ রূপেই উৎপন্ন হয়, প্রত্যক্ষাকারে উৎপন্ন হয় না" ইত্যাদি প্রকারে উহার খণ্ডন করিয়াছেন, পরে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ধ্রুবা স্মৃতি নামক জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। ধ্রুবা শব্দের অর্থ নিশ্চল অথবা স্থায়ী। স্মৃতিশব্দের অর্থ পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ। সাধক শাস্ত্রশ্রবণকালে যে ব্রহ্মলক্ষণ শুনিয়াছেন তল্লক্ষণান্বিত ব্রহ্মকে অধিকতর প্রগাঢ় রূপে স্মরণ করার নাম ধ্রুবা স্মৃতি। এই ধ্রুবা স্মৃতি কোথাও ধ্যান শব্দে, কোথাও উপাসনা শব্দে, কোথাও নিদিধ্যাসন শব্দে, কোথাও ব্রহ্মজ্ঞান শব্দে এবং কোথাও বা বেদন শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদন অর্থাৎ জানা। ধ্যান প্রগাঢ় বা পরিপক্ক হইলে তাহা প্রত্যক্ষ দর্শনের সহিত সমান হইয়া পড়ে। এই ধ্রুবা স্মৃতি ও নিদিধ্যাসন প্রভৃতি নামের নামী ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সাধন চতুষ্টয় নহে, সাধন সপ্তক বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাদ ও অনুদ্ধর্ষ এই সাত সাধনে সিদ্ধ হইতে পারিলে জীব উক্তবিধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। বিবেকাদি শব্দের অর্থ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। বিবেক অর্থাৎ ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেচনা। নিষিদ্ধ ভক্ষ্য বর্জ্জন এবং বিহিত ভক্ষ্য ভক্ষণ। আরও বিশদ কথা—সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি ও সংশোধন যদ্দ্বারা হয় তাহাই ভক্ষণ করা।

২। বিমোক শব্দের অর্থ—ত্যাগ। ত্যাগের সীমা—কাম্য কামনা বা ভোগাশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ।

৩। অভ্যাস শব্দের অর্থ—পুনঃ পুনঃ স্বায়ত্ত করা। অর্থাৎ অনবরত ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলন করা।

৪। ক্রিয়া শব্দের অর্থ—যথাশক্তি শাস্ত্রবিহিত নিত্য কর্ম্মাদি করা।

৫। কল্যাণ শব্দের অর্থ—সত্য, সারল্য দয়া, দান (লোভ পরিত্যাগ) অহিংসা ও বৃথা চিন্তা পরিত্যাগ।

৬। অনবসাদ শব্দের অর্থ—শোকাদির দ্বারা অভিভূত না হওয়া।

৭। অনুদ্ধর্ষ শব্দের অর্থ—ইষ্ট লাভাদির দ্বারা অতিহৃষ্ট না হওয়া। *

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্ম কি তাহা বুঝাইবার জন্য একটী লক্ষণ বলিয়াছেন, এই প্রপঞ্চ (জগৎ) যাহা হইতে জন্মিয়াছে, জন্মিয়া যাহাতে অবস্থিতি করিতেছে, এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা ব্রহ্ম। বাদরায়ণের ঐ কথায় ব্রহ্ম কিংস্বরূপ? সাকার কি নিরাকার? সগুণ কি নির্গুণ? দ্বৈত? কি অদ্বৈত? তাহা ঠিক্ বুঝা যায় না। শ্রুতি ও যুক্তি অবলম্বনে বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। কাজেই যিনি যেমন বুঝেন তিনি তেমনি বলেন, উপদেশ করেন। এ সম্বন্ধে শঙ্কর ও রামানুজ যে সকল বিচার করিয়াছেন, সে সকলের মধ্য হইতে কতিপয় প্রধান সিদ্ধান্ত এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

১। ব্রহ্ম নিরাকার অর্থাৎ অমূর্ত্ত। প্রপঞ্চান্তর্গত প্রত্যেক মূর্ত্তের নাম ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকৃতি বাদ দিলে যে অনাকৃতি ও

* রামানুজের এই সাধন সপ্তক শঙ্করের সাধন চতুষ্টয়ের মধ্যে নিবিষ্ট আছে।

অব্যপদেশ্য অস্তিতা, প্রকাশিতা ও প্রিয়তা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। নামও আকৃতি অস্থায়ী ও আগন্তুক ও পরিবর্ত্তনশীল সেজন্য তাহা মিথ্যা। অবশিষ্ট নিত্য স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তন স্বভাব, সেজন্য তাহাই খাঁটী সত্য। নাম ও আকৃতি সমীম অর্থাৎ অল্পাধিক আকারে সীমাবদ্ধ। পরন্তু অবশিষ্ট সর্ব্বত্রানুভূত বলিয়া অসীম ও অপরিচ্ছিন্ন। সুতরাং ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বরূপ লক্ষণ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি। সৎ চিৎ, আনন্দ, এই তিনটি শব্দ উচ্চারণ করা হইল বটে, পরন্তু বস্তু একটী। যেমন দাহও অগ্নি, ঔষ্ণ্য ও অগ্নি, তাহার আলোকও অগ্নি, তেমনি সত্যও ব্রহ্ম, চৈতন্য বা প্রকাশও ব্রহ্ম, প্রিয়তা বা সুখও ব্রহ্ম। এই অমূর্ত্ত ব্রহ্ম মিথ্যাভূত মূর্ত্ত প্রপঞ্চের মূলে মধ্যে ও অবসানে সদা বিদ্যমান। সুতরাং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ ও আধার।

২। মূর্ত্ত প্রপঞ্চ বা দ্বৈত মায়িক, মায়িক বলিয়া মিথ্যা। যে আধারে মূর্ত্ত প্রপঞ্চ রজ্জু সর্পের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে সেই সর্ব্বাধার অমূর্ত্ত ব্রহ্মই পরম সত্য।

৩। জীবে যে অনুভূতি বিদ্যমানা, সেই অনুভূতি উপরের লিখিত সৎ চিৎ আনন্দের অব্যতিরিক্ত। তাহাই নিত্য নির্ব্বিকার নিরাকার নির্ব্বিশেষ নির্গুণ। উহা সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ বর্জ্জিত—অত্যন্ত নির্ব্বিভেদ পরম বস্তু।

৪। উক্ত অনুভূতিই মুখ্য আত্মা। অহং পদার্থ মুখ্য আত্মা নহে। যে জ্ঞান গুণ বলিয়া গণ্য, সে জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্ম্ম, আত্মার ধর্ম্ম নহে।

৫। মুখ্য আত্মা ও পরব্রহ্ম একই বস্তু, সেজন্য উক্ত উভয়ের ঐক্য প্রমা (সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান) তদ্বিষয়ক অনাদি অনির্ব্বাচ্য অজ্ঞানের নাশক।

৬। অদ্বৈতই ঠিক্, দ্বৈত ইন্দ্রজালবৎ মায়িক। শ্রুতি দুই প্রকার থাকিলেও অদ্বৈত শ্রুতি প্রবলা এবং দ্বৈত শ্রুতি দুর্ব্বলা। দুর্ব্বল শ্রুতিকে প্রবলের অনুগামী করিয়া ব্যাখ্যা করা ন্যায়সিদ্ধ।

শঙ্করের এই সকল সিদ্ধান্ত রামানুজ ভাষ্যের পূর্ব্বপক্ষ। এ সম্বন্ধে যাহা রামানুজের সিদ্ধান্ত তাহা নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১। ব্রহ্ম অত্যন্ত নিরাকার নহেন। তাঁহার প্রাকৃত আকার না থাকিলেও জ্ঞানানন্দাদিময় আকার আছে।

২। প্রপঞ্চও সত্য। যেহেতু প্রপঞ্চ ব্রহ্মোদ্ভব, সেই হেতু প্রপঞ্চ সত্য। যেমন সত্য মৃত্তিকায় মিথ্যা ঘট হয় না, তেমনি, সত্য ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিক মিথ্যা প্রপঞ্চ হয় না। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব কথা আপেক্ষিক মাত্র। অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সমান সত্য নহে বলিয়াই শাস্ত্রে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব বর্ণিত হয়। ঘট যেমন মৃত্তিকার সহিত সমান সত্য নহে, (সমস্থায়ী নহে), সেইরূপ, প্রপঞ্চও ব্রহ্মের সহিত সমান সত্য নহে।

৩। মায়ামাত্রেই যে মিথ্যা, তাহা নহে। শ্রুত্যুক্ত মায়া ভগবদিচ্ছারূপা, সেজন্য তাহা মিথ্যা নহে। সেজন্য তদুপাদানক প্রপঞ্চও মিথ্যা নহে।

৪। দ্বৈতাদ্বৈত শ্রুতির মধ্যে দ্বৈত শ্রুতিই প্রবলা, অদ্বৈত শ্রুতি দুর্ব্বলা। সুতরাং অদ্বৈত শ্রুতিগুলি দ্বৈতশ্রুতির অনুগুণে ব্যাখ্যেয়।

৫। নির্ব্বিশেষ বা অত্যন্ত নির্গুণ বস্তু অপ্রামাণিক। কোনও প্রমাণে উহা প্রমিত হয় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ,

সমুদায় প্রমাণ সবিশেষ পদার্থের গ্রাহক, নির্ব্বিশেষ পদার্থের গ্রাহক নহে। সেজন্য, বিশিষ্ট বস্তুই প্রামাণিক, নির্ব্বিশেষ বস্তু অপ্রামাণিক।

৬। সৎ ও অনুভূতি এক অর্থাৎ অভিন্ন নহে' নির্বিশেষও নহে। অপিচ, অনুভূতি অনিত্য আগন্তুক, বিকারী, ও সবিশেষ।

৭। প্রোক্ত কারণে অনুভূতি আত্মা নহে। অহং পদার্থই আত্মা, অনুভূতি তাহার ধর্ম্ম। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি পরিবর্ত্তনশীল সমুদায় অবস্থায় অনুভূতির অনুবৃত্তি দেখা যায়, সুতরাং মোক্ষে অহং-এর অনুবৃত্তি থাকে। অতএব, অহং পদার্থই আত্মা, তদতিরিক্ত অনাত্মা।

লোকে জীব ব্রহ্মের ঐক্য হয় বটে, পরন্তু সর্ব্বতোভাবে বা সর্ব্বাকারে ঐক্য হয় না। স্বরূপ ঐক্য হয় না অর্থাৎ দুএ এক হইয়া যায় না।

আত্মা জ্ঞানরূপী বটে; জ্ঞান গুণও বটে।

১০। অদ্বৈতই তত্ত্ব, ইহা সত্য বটে; পরন্তু নির্বিশেষ একাদ্বৈত শ্রুত্যভিপ্রেত নহে। অদ্বৈত দ্বিবিধ। প্রকারাদ্বৈত ও প্রকারী অদ্বৈত। ব্রহ্মাদ্বৈত ও জীবাদ্বৈত। ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, এ কথার অর্থ—"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" ব্রহ্মান্তর ব্রহ্মের অধিক বা ব্রহ্মের সমান নাই। ইহা ভিন্ন তাহার প্রকারান্তর নাই, অর্থাৎ তিনি নিষ্প্রকার বা নির্বিশেষ, এমন অর্থ নহে। "একঃ সন্ বহুধা বিচচার" অর্থাৎ তিনি একই ব্রহ্ম দেব মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদি শরীরে বিরাজিত, এই শ্রুতির অর্থে স্থির হয় যে, তিনি এক বটেন, পরন্তু বহু প্রকারে ও অর্থাৎ বহু আধারে বিরাজিত। তিনি সর্ব্বত্রই জ্ঞানাকারে বিরাজিত, আকারান্তরে নহে। অতএব, প্রকারগত ভেদ থাকিলেও প্রকারী ব্রহ্ম এক বা অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতকে প্রকারি অদ্বৈত বলা যায়। জীব অনেক, পরন্তু সর্ব্বত্র সকল জীব একই প্রকার সে জন্য অর্থাৎ এক প্রকারতা লক্ষ্য করিয়া জীবের উপরেও এক অদ্বিতীয় শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। এতদনুসারে, জীবের ঐ প্রকার অদ্বৈতকে প্রকারাদ্বৈত বলা যায়।*

ক্রমশঃ।

প্রার্থনা (৩)।

মাতৃ-স্নেহ।

কিবা স্নেহ ধরে মাতা। সুরূপ কুরূপ
দেখেনা মা সন্তানের। স্নেহ-ধন জানে
তারে। স্নেহ-চখে দেখে, অমিয় বচন
স্নেহ-মাখা বলে; স্নেহে লয়ে কোলে চাঁদ
মুখ চুমে। কতভাবে মা রোগিলে শিশু,
নীরোগিতে তারে কত করে প্রাণ পণে।
অবাধ্য শিশুরে রাখে মা নয়ন-আড়ে,
কি জানি অপথে যদি হারায় জীবন।
কি জানে অবোধ শিশু কি গৃহ-দেবতা
অদৃশ্যে যাচিয়ে ভাল বাসে তারে কত,
বিঘ্ন-কাঁটা গায়ে তার না লাগে আঁচড়,
স্নেহের আড়ালে লয়ে হেন রাখে তারে।
উপমিব তব স্নেহ মাতৃ-স্নেহ সনে
জগৎ-জননি! হেরি তব স্নেহ-কণা
মায়ের হৃদয়ে, স্পর্দ্ধা মনে উপমিতে
নিরুপমে! কি জানিব আমি অভাজন মূঢ়
স্নেহের মূরতি তব, কত সুধা তায়!
সম্পদ, বিপদ, সব স্নেহে দাও তুমি।
গরল সন্তানে কভু না দেয় জননী।

---

* এই অদ্বৈততত্ত্ব স্থানান্তরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবেক।

নির্ব্বতে সন্তানে দীপ নিবায় মা স্নেহে,
নিবাইয়া সুখ-দীপ তেমতি জননি!
দুখের আঁধারে লয়ে নিবারি কুটিল
কামনা, কু-আশা মোহ পোষিছ পরাণ।
তারিবে অধমে কি মা সংসার সঙ্কটে?
দয়া করি দাও চখে জ্ঞানের অঞ্জন,
দেখি বিষয়ের পথ শুধু তমোময়,
ত্যজি তাহা—যাই তব অমৃতের পথে।
কৃপা করি ক্ষম মাগো করেছি যে পাপ,
পাইতেছি যার তারে কত মনস্তাপ,
হায়রে আগেতে যদি সঁপিতাম প্রাণ,
দেহ সরবস্ব মোর তোমার চরণে,
তাহ'লে তোমার কাজ করিতাম কত,
জীবন হইত মোর কত মধুময়,
পরাণ দহিছে-কত সুযোগ ছাড়িনু।
মোহ আলস্যের বশে বিষয়ে ডুবিনু,
দয়া করি বলিবে কি মরণ সময়,
"গণিব না আমি তোর পাপ সমুদয়,"
তবে ত সুখের মম হইবে মরণ।
তবে ত পাইব আমি তব শ্রীচরণ॥

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

২৪শ প্রস্তাব।

যুদ্ধকাণ্ড।

কুম্ভকর্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাবণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! মৃত্যুকাল উপস্থিত, বলশালী রাম সুগ্রীব সাহায্যে আমাদের মূলোচ্ছেদ করিতেছে। তুমি বানর সৈন্য সহিত রাম লক্ষ্মণের বিনাশ সাধন কর। কুম্ভকর্ণ কহিল রামচন্দ্র পরমপুরুষ নারায়ণ, সীতা যোগমায়া, ইহা আমি মহর্ষি নারদের মুখে শুনিয়াছি, তুমি বৈরীভাব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামের ভজনা কর। তচ্ছ্রবণে দশগ্রীব ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কুম্ভকর্ণও নিরুপায় হইয়া রামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অসীম বীরত্ব দেখাইয়া পরিশেষে জীবন বিসর্জ্জন দিল। নারদও ইত্যবসরে গগনমণ্ডল হইতে রাম-সকাশে অবতীর্ণ হইয়া নারায়ণবোধে তাঁহার স্তব-স্তুতি করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে রামের সহিত যুদ্ধকরণ মানসে রাবণের অনুমতি লইয়া দৈবকার্য্য সাধনার্থ নিকুম্ভিলায় প্রবেশ করিল। লক্ষ্মণ বিভীষণের মন্ত্রণাবলে যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিয়া যে কিরূপে তাঁহার বিনাশ সাধন করেন, তাহা আমরা মূল রামায়ণ হইতে দেখাইয়াছি। পরিশেষে রাবণ ক্রোধে অভিভূত হইয়া দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নির্দ্দেশ মতে রণে অজেয় হইবার জন্য নির্জ্জনে হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিভীষণ দূর হইতে হোমধূম অবলোকনে ভীত হইয়া রামকে কহিলেন আপনি অচিরাৎ হোম-বিঘ্ন উৎপাদন করুন।

হনুমান অঙ্গদাদি তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হইল। বিভীষণ-ভার্য্যা সরমার ইঙ্গিত মতে হোমস্থানের নির্দ্দেশ পাইয়া তাহারা গুহা-মুখস্থিত পাষাণ পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, রাবণ মুদ্রিত-নয়নে দৃঢ়াসনে উপবিষ্ট। বানরগণ তদ্দর্শনে হব্যসামগ্রী অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, হনুমান রাবণের হস্ত হইতে স্রুব কাড়িয়া লইয়া তদ্দারা রাক্ষসরাজকে প্রহার করিল। কেহবা দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা রাবণকে আঘাত করিতে লাগিল। রাবণ তথাপি বিজিগীষাবশতঃ ধ্যান পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অঙ্গদ রাবণের ধ্যানভঙ্গ মানসে অন্তঃপুর হইতে রোরুদ্যমানা মন্দোদরীকে কেশমুষ্টি ধারণে রাবণের সম্মুখে আনয়ন করিল ও বিবিধ

বিধানে তাঁহার অবমাননা করিতে আরম্ভ করিল। রাবণ প্রাণসমা পত্নীর আর্ত্ত-নাদে আর বধির থাকিতে পারিলেন না। হোম পড়িয়া থাকিল, তিনি উঠিয়া পড়িলেন, বানরগণও তথা হইতে পলায়ন করিয়া রামপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাবণ মন্দোদরীকে সান্ত্বনা-দানে উদ্যত হইলে মন্দোদরী দুঃখিতভাবে কহিলেন, দেখ তুমি বা অপরে রামচন্দ্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না; রাম সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, এখনও যুদ্ধকামনা পরিত্যাগ কর, বিদেহনন্দিনীকে রামসমীপে প্রেরণ করিয়া বিভীষণকে রাজ্য দিয়া আমাকে লইয়া অরণ্যে চল। রাবণ কহিলেন, পুত্রহীন ভ্রাতৃহীন রাক্ষসমণ্ডলবিহীন হইয়া জীবন ধারণে ফল কি? আমি রাম ও সীতাকে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী জানিয়াই বলপূর্ব্বক সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি। মুমুক্ষুগণ যে নির্ম্মল পরমানন্দময় স্থান লাভ করেন, আমি রামের হস্তে নিহত হইয়া নিশ্চয়ই সেই স্থানই প্রাপ্ত হইব।

রাবণ রণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তালতরু হইতে যেরূপ ফলরাজি নিপতিত হয়, রাবণের বহুতর মস্তক রক্তাক্ত হইয়া সেরূপ পতিত হইয়াও আবার উঠিতে লাগিল। ফলতঃ রাবণের কবন্ধ কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না। রাম বিভীষণের নির্দ্দেশে আগ্নেয় অস্ত্রে রাবণের নাভিদেশ বিদ্ধ করিলেন। রাবণ ক্রমে নিস্তেজ হইয়া একমাত্র মস্তক ও দুই বাহু দ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন। রামও নিশ্বসন্ত সর্পের ন্যায় এক প্রদীপ্ত শর ধনুকে যোজনা করিয়া তাহা অতিবেগে নিক্ষেপ করিলেন। সেই মর্ম্মঘাতী ভীষণ অস্ত্র রাবণের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। রাক্ষসরাজ গতজীবন হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে বেগে ভূতলে নিপতিত হইলেন। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেবতাগণ দেখিলেন সূর্য্য-তুল্য ভাস্বরজ্যোতিঃ রাবণের দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া রঘুবরে প্রবিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে তাঁহারা কহিলেন অহো! রাবণের কি সৌভাগ্য! আমরা সত্ত্বগুণ-প্রধান দেবগণ, তথাপি আমাদের ভয় দুঃখ শোকাদি আছে, আমরা ঈশ্বরের স্নেহের সামগ্রী, তথাপি আমাদিগকেও সংসারে যাতায়াত করিতে হয়। *

> বয়ং তু সাত্ত্বিকা দেবা বিষ্ণোঃ কারুণ্যভাজনাঃ,
> ভয়দুঃখাদিভির্ব্যাপ্তাঃ সংসারে পরিবর্ত্তিনঃ।
>
> ৮০ শ্লো। ১১ অঃ।

কিন্তু এই রাক্ষস ক্রূর, ব্রহ্মঘাতী, অতীব তমোগুণসম্পন্ন, পরস্ত্রীতে আসক্ত, তথাপি সে সাক্ষাৎ নারায়ণ রামচন্দ্রে প্রবিষ্ট হইল। নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাবণ সর্ব্বদা রামের প্রতি দ্বেষ বশতঃ ভৃত্যগণের সহিত নিরন্তর দ্বেষভাবে রামচরিত শ্রবণ করিত, রামের হস্তে আপনার নিধন জানিয়া ভয়ে সর্ব্বত্র রামকে দেখিতে পাইত, প্রত্যহ রামকে স্বপ্ন দেখিত; রামের প্রতি রাবণের ক্রোধ গুরূপদেশ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হইয়াছিল। রাবণ রামহস্তে বিনষ্ট হইয়া বিধৌতপাপ ও বন্ধনমুক্ত হইয়া রামসাযুজ্য প্রাপ্ত হইল। এই বলিয়াই সুললিত ছন্দে বলিলেন

> পাপিষ্ঠো বা দুরাত্মা পরধনপরদারেষু সক্তো যদি স্যা-
> ন্নিত্যং স্নেহাৎ ভয়াদ্বা রঘুকুলতিলকং ভাবয়ন্ সম্পরেত।

---

* দেবতাগণও যে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত নহেন, তাঁহাদিগকেও যে লোক পরিভ্রমণ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতামত পাঠকগণ আমাদের প্রকাশিত "পরলোক ও মুক্তি" নামক পুস্তকে দেখিতে পারেন।

লেখক।

ভূত্বা শুদ্ধান্তরঙ্গো ভবশতজনিতানেকদোষৈ র্বিমুক্তঃ
সদ্যো রামস্য বিষ্ণোঃ সুরবরবিনুতং যাতি বৈকুণ্ঠমাদ্যম্
৮৬। ৮৭ শ্লো। ১১ শ অধ্যায়

ভয় বশতই হউক, আর স্নেহ বশতই হউক, যে, যে অবস্থায় যে ভাবে কেন ঈশ্বরের নাম করুক না সে সদ্য মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহাই যেন সমগ্র অধ্যাত্মরামায়ণের শেষ মীমাংসা। অধ্যাত্মরামায়ণকার যেন ইহাই পরিচ্ছিন্ন ভাবে বিবৃত করিতে গিয়াই এই ধর্ম্মগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন দেখ রাবণ কখন রামচন্দ্রকে প্রেমের চক্ষে দেখিল না। তাঁহার ভাই, বন্ধু স্ত্রী সকলেই তাঁহাকে রামের প্রকৃত স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলই বিফল হইল। রাবণ কিছুতেই রামের সীতাকে ফিরাইয়া দিলেন না। অবশেষে নিজেই বিনষ্ট হইলেন।

বৈরীভাবেও ঈশ্বরের নাম লইলে যে মুক্তিলাভ হয়, এ কথাটি বড়ই মধুর, বড়ই আশাপ্রদ। আমরা মোটামুটি যেরূপ দেখিতে পাই তাহাতে অর্থী ও বিপন্ন লোকেই ঈশ্বরের নাম করে, নিরবচ্ছিন্ন তাঁহাকেই লাভ করিব এই উদ্দেশে তাঁহার পথের পথিকের সংখ্যা জগতে বড়ই বিরল। অধ্যাত্মরামায়ণকার দেখাইতে চাহেন যে শুদ্ধ অর্থী ও বিপন্ন কেন, রাবণ বা মিল্‌টনের প্যারাডাইজ-লষ্টের সয়তানের মত মহাপাপী, যাহারা ঈশ্বরের প্রেমের রাজ্য ছারখার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, যাহারা ঘৃণার চক্ষে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহাদের মুখ হইতে অজ্ঞাতসারে ভগবানের নাম বাহির হইলে তাহারাও মৃত্যুঅন্তে মুক্তি লাভের অধিকারী।

এদেশের মধ্যযুগের অর্থাৎ পৌরাণিক কালের শাস্ত্রকারগণের সমস্ত মনোযোগ কেবল ইতর সাধারণের (Mass) মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগ্রত ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই যেন ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহাদের বড় আশঙ্কা ছিল যেন সাধারণে উন্নততম ধর্ম্ম বা সাধন-লভ্য ঈশ্বর ধরিতে না পারিয়া নাস্তিক হইয়া না যায়। ফলত তাঁহাদিগকে অজ্ঞানান্ধ লোক লইয়াই বেশী নাড়াচাড়া করিতে হইত। তাই তাঁহারা অভয়বাণী রাখিয়া গিয়াছেন যে স্নেহ বা ভয়ে ঈশ্বরের নাম লও, বৈরীভাবে বা প্রেমের চক্ষে তাঁহাকে দেখ, তোমাদের সকলেরই মুক্তি সুনিশ্চিত। বলিতে কি ইহা শুনিয়া পাপী পুণ্যবান সকলেরই শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। যিনি দয়ারূপিণী পরমমাতা তাঁহার দয়ার গভীরতাই এইরূপ বটে!

এক্ষণে কথা হইতেছে মুক্তি কি এতই সহজগম্য। অধ্যাত্মরামায়ণকার মুক্তি লাভ কি এতই সহজ বোধ করেন। যাঁহারা অধ্যাত্মরামায়ন নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা কেহই একথা বলিতে সাহস করিবেন না। শাস্ত্রকার নিজ পুস্তকে বহুল স্থলে ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের কথা এতই বিবৃত করিয়া বলিয়া গিয়াছেন এবং তৎসমস্ত এতই মধুর এতই জ্ঞানপূর্ণ যে তাহা অন্যান্য গ্রন্থে বড়ই বিরল।

তবে অনেকে বলিতে পারেন যে, বৈরীভাবে ঈশ্বরের নাম লইলে যদি মুক্তি হয়, একবারমাত্র গঙ্গাস্নানে যদি শুদ্ধ নিজে কেন ত্রিকোটি কুল পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া যায়, বারেক তীর্থ ভ্রমণে যদি মৃত্যু অন্তে মোক্ষাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে আর কঠোর-সাধ্য ধর্ম্মের সাধনার আবশ্যকতা কোথায় রহিল, মুক্তিরই বা গুরুত্ব কোথায় গেল। হিন্দুধর্ম্মের প্রত্যেক সামান্য

শুভ কার্য্যের পুরস্কার মুক্তি হইলে, লোকে যে যুগযুগান্ত ধরিয়া মুক্তি লাভের জন্য হাহাকার করিতেছে, তাহাদের নিষ্কারণ ক্রন্দন বাতুলতা হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে আমাদের উত্তর এই যে মধ্যযুগে দেশের ঘোর অজ্ঞানতার অবস্থায় পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সময়ে আমাদের দেশের শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণ মুক্তিদানে যে বাস্তবিকই কল্পতরু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের অধিকার বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে গেলে ধর্ম্মের পুরস্কার সম্বন্ধে এরূপ উন্নত আশা ধারণ এক প্রকার অনিবার্য্য। জ্ঞানোন্নত সময়ে সত্যধর্ম্মের প্রকৃত বিকাশের অবস্থায় ধর্ম্ম নিষ্কাম, কিন্তু যখন ধর্ম্ম ম্লান ভাব ধারণ করে, জনসমাজ মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চার খর্ব্বতা হইয়া আইসে, তখন সে দেশে সে অবস্থায় ধর্ম্ম সকাম না হইয়া থাকিতে পারে না। এবং এই শেষোক্ত অবস্থায় শাস্ত্রকারগণকেও লোকসাধারণকে আকর্ষণ করিবার জন্য ধর্ম্মের পুরস্কার সম্বন্ধে কল্পতরু না হইলে চলে না। তাই এদেশের দুর্গোৎসব অশ্বমেধফলপ্রদ, গঙ্গাস্নান মুক্তিপ্রদ, তীর্থদর্শন মোক্ষপ্রদ, বৈরীভাবে সাধন ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রদ, স্ত্রীলোকের ব্রতনিয়মাদি অশেষ কাম্যবিষয়প্রদ। এবং এখানে ইহাও স্বীকার্য্য—যে এই সকল কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানে পুরস্কারলাভের আশা এত বিপ্লবের মধ্যেও এদেশের নরনারীকে আজও সমধিক পরিমাণে ধর্ম্মের সহিত দৃঢ়যুক্ত রাখিয়াছে। তাই বলিয়া জ্ঞানী সাধকের নিকটে মুক্তিও কিছু সহজগম্য নহে, এবং তাহার সাধনাও কিছু সহজ নহে।

আজ কাল লোকে প্রতি কথায় ছল ধরিতে চাহে। এক সময় ছিল লোকে নিম্ন-অধিকারীর সাধন ও বিশ্বাস লইয়া বিদ্রুপ করিতে সাহসী হইত না, এবং প্রবৃত্তিও ছিল না। গীতাকারও বলিয়া গিয়াছেন যাহারা অবিবেকী তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহারা স্থূল বুদ্ধিতে যাহা করিতেছে করিতে দাও। নিষ্কারণ তাহাদের অন্তরে সংশয়ের বীজ রোপণ করিও না, কেন না উহার অবশ্যম্ভাবী ফল নাস্তিকতা। কিন্তু বর্ত্তমানে এই ঘোর পরিবর্ত্তনের সময় সে কথা টেঁকিতে পারে না। বহুকালের বদ্ধভাবের পর স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হইলে তাহার পরিনাম সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

সে যাহা হউক রাবণ বিনষ্ট হইলে বিভীষণ রাবণরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। হনুমান কর্ত্তৃক সীতা শিবিকাযোগে আনীত হইলে সেই মায়াসীতাকে অবলোকন করিয়া রাম তাঁহাকে অবক্তব্য কটু বাক্য কহিতে লাগিলেন। সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণকে অগ্নি জ্বালিতে বলিলেন; অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সীতা তাহাতে প্রবেশ করিলেন। হুতাশন দিব্যভূষণে অলঙ্কৃতা জনক-তনয়াকে ক্রোড়ে লইয়া রঘুবরকে কহিলেন, প্রভু! দশাননের প্রাণ-বিনাশের জন্য মায়াসীতা নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বে বনে যাঁহাকে আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, এই সেই (প্রকৃত) দেবী জানকীকে গ্রহণ করুন। রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা সেই প্রতিবিম্বরূপিণী সীতা এক্ষণে অন্তর্হিতা হইয়াছেন। অনন্তর রাম আনন্দ সহকারে সেই সীতাকে গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণও রামের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

বিভীষণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে রাম

অযোধ্যা-নগরী যাইতে উৎসুক হইলেন। বিভীষণ অঙ্গদ হনুমানাদি তাঁহার পুষ্পক রথের সহযাত্রী হইল। অযোধ্যায় পৌঁছিলে রামের রাজ্যাভিষেক বৃত্তান্তে নূতনত্ব কিছুই নাই। রাম দশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে প্রজাবর্গের সুখের ইয়ত্তা ছিল না। এই খানেই লঙ্কাকাণ্ড শেষ হইল।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে রামের সর্ব্বজ্ঞত্ব বজায় রাখিতে গিয়া মায়াসীতা কল্পনায় ও তাঁহার অগ্নিপরীক্ষাদিতে পাঠকের কাব্যঘটিত ঔৎসুক্য বিনষ্ট হইয়াছে, কবিত্বের দারুণ ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। বাল্মীকি এই এই স্থলে যে রচনাকৌশল দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই জগতে অতুলনীয় ও তজ্জনিত কাব্য-জগতে তাঁহার সিংহাসন এতই মহিমান্বিত।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে অধ্যাত্ম রামায়ণকার একস্থানে বলিয়াছেন যে ঈশ্বর নিরাকার হইলেও জগৎ পালনেচ্ছাবশত তাঁহার দুই দেহ, বিরাট শরীর—স্থূল দেহ এবং হিরণ্য-গর্ভ—সূক্ষ্ম দেহ। এই সমস্ত সহস্র সহস্র অবতার বিরাট দেহেরই হইয়া থাকে, আবার প্রয়োজন সিদ্ধি হইলেই ঐ সকল অবতার-দেহ বিরাট-দেহেই প্রবিষ্ট হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে, রাবণবধের জন্য ত রামের জন্ম; রাবণবধ ত হইয়া গেল; তাঁহার আবার মনুষ্যরাজ্যে প্রয়োজন কি? যাঁহার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে ক্ষণ মধ্যে ত্রিলোক বিনষ্ট হয়, তাঁহার পক্ষে মনুষ্যরাজ্য কতটুকু জিনিস! শাস্ত্রকারের উত্তর এই ভক্তগণের মনোরথ পূরণেচ্ছায় লীলামনুষ্যশরীরে সকল ব্যবহার অনুসারেই তিনি চলিয়া থাকেন।

ষোড়শ অধ্যায়ে আছে রাম রাজা হইয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে পরমাত্মা তাঁহার আবার যজ্ঞ কি? শাস্ত্রকারের উত্তর এই যে সমস্তই লোকশিক্ষার্থ।

এইরূপে শাস্ত্রকার যতদূর পারিয়াছেন, রামের অবতারত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এই অভিষ্টসিদ্ধির জন্য রামের ঐতিহাসিক জীবনও আবশ্যকমত অল্পাধিক পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি, যদি বাল্মীকি রামায়ণের অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে না হয় রামের অবতারত্ব একদিন বজায় থাকিত। আমরা যতদূর দেখাইয়াছি, তাহাতে যুক্তি ও ইতিহাস উভয়েই রামের অবতারত্বের বিরোধী। আগামী বারে সমগ্র উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পুরাকালের বিবাহ।

এক সময়ে এই ভারতে পাত্র ও পাত্রী নির্বাচনে পিতা জাতিকুলের সমাদর না করিয়া একমাত্র গুণেরই যে বিশেষ গৌরব করিত, রাজাধিরাজের পুত্র প্রার্থী হইলেও কন্যার পিতা কেমন অকুণ্ঠিত-ভাবে পাত্রের পদমর্য্যাদা তুচ্ছ করিয়া তদীয় দেহ মনের নানা রূপ শক্তি পরীক্ষা করিত, বুদ্ধের বিবাহে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। এক্ষণে আমরা পাঠকদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে সেই অংশ নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বুদ্ধদেব অল্প বয়সেই সংসার-বিরাগী। রাজা শুদ্ধোদন তাঁহাকে সং-

সারাসক্ত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেন কিন্তু কিছুতেই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। একদা মনে করিলেন পুত্র স্ত্রীগণপরিবৃত থাকিলে আর সংসারত্যাগের কামনা করিবেন না। এই চিন্তা করিয়া শাক্যবংশীয় বৃদ্ধগণ দ্বারা তাঁহার নিকট বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। শুনিয়া বুদ্ধ মনে করিলেন, কামই সমস্ত শোক দুঃখের মূল, উহা অসিধারা তুল্য ও জ্বলনসন্নিভ। উহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আবার ইহাও ভাবিলেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বোধিসত্ত্বেরা স্ত্রীপুত্রপরিবৃত হইয়াও ধ্যানভ্রষ্ট হন নাই, যাহা হউক পিতার অনুরোধে আমি তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করিব।

এই স্থির করিয়া কহিলেন, আমি বিবাহে সম্মত আছি, কিন্তু পিতা যাঁহাকে আমার বধূরূপে বরণ করিবেন তাঁহার সর্ব্বাংশে আমার অনুরূপ হওয়া চাই, প্রাকৃত স্ত্রীলোকের ন্যায় তাঁহার ঈর্ষাদি দোষ থাকিলে চলিবে না। তিনি সুরূপা হইবেন কিন্তু তাঁহার রূপগর্ব্ব যেন কিছুমাত্র না থাকে। তিনি মাতা ও ভগিনীর ন্যায় স্নেহবতী হইবেন, শ্রমণ ব্রাহ্মণকে যথাসামর্থ্য দান করিয়া স্বধনে নিত্য সন্তুষ্ট থাকিবেন। শঠতা ও কপটতা দোষ তাঁহার যেন না থাকে। তিনি স্বীয় ভর্ত্তার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া স্বপ্নেও পরপুরুষ কামনা করিবেন না। সদা সংযত ও অপ্রমত্ত হইবেন। তাঁহার পানদোষ যেন না থাকে। আর যিনি সত্যে স্থিত, ঔদ্ধত্য ও চাঞ্চল্যরহিত, লজ্জাশীল ও ধর্ম্মনিরত সেইরূপ বধূই আমার জন্য মনোনীত করুন। যিনি কায়মনো বাক্যে আপনার পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ, যিনি মানমূঢ় নহেন, এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের প্রতি ভক্তিপরায়ণা, দাসদাসীর প্রতি যাঁহার আত্মবৎ প্রেম, যিনি সর্ব্বশেষে শয়ন ও সর্ব্বাগ্রে উত্থান করিতে সমর্থ 'তাং তাদৃশীং মম বধূং বরয়স্ব তাত' সেইরূপ বধূই আমার জন্য মনোনীত করুন।

শুদ্ধোদন লোকমুখে পুত্রের এইরূপ অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণকে কহিলেন আমার পুত্র বিবাহে সম্মত, তিনি বধূর কুলার্থী বা গোত্রার্থী নহেন কেবল গুণার্থী। তাঁহার দৃষ্টি কেবল বধূর গুণ সত্য ও ধর্ম্মের প্রতি। অতএব তুমি কপিলবস্তু নগরে রাজকুমারের জন্য কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য কি শূদ্র যে বর্ণেই হউক এইরূপ রূপবতী ও গুণবতী কন্যা অনুসন্ধান করিয়া সত্বর আমাকে সংবাদ দেও।

ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রীং তথৈব চ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়।
ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ।
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ।

অনন্তর পুরোহিত, রাজা শুদ্ধোদনের আদেশে কপিলবস্তু নগরের গৃহে গৃহে অনুসন্ধান পূর্ব্বক একস্থলে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা দেখিতে পাইলেন। তিনি নাতিহ্রস্বা নাতিদীর্ঘা নাতিস্থূলা নাতিকৃশা নাতিগৌরী নাতিকৃষ্ণা এবং নবযৌবন সম্পন্না। ঐ কন্যা পুরোহিতকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন আপনি কোন্ উদ্দেশে আসিয়াছেন। পুরোহিত কহিলেন রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র সুরূপ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তিনি বিবাহার্থী, যে কন্যা সর্ব্বগুণসম্পন্না হইবেন তিনি তাঁহাকেই পত্নীত্বে বরণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে গাথা রচনা করিয়া দিয়াছেন এই লও, তুমি ইহা পাঠ কর। তখন ঐ কন্যা পুরোহিতের হস্ত হইতে গাথা লেখ্য লইয়া সস্মিত মুখে আদ্যো-

শাস্ত্র সমস্ত পাঠ করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ, আমাতে এই সমস্ত গুণ আছে। অতএব সেই স্বরূপ যুবা আমারই পতি হউন। এক্ষণে আপনি তাঁহাকে গিয়া বলুন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, হীন প্রাকৃত লোকের সহিত আমার সংযোগ না হৌক। তিনিই আমার ভর্ত্তা হউন।

ভণহি কুমারু যদি কার্য্য মা বিলম্ব
মা হীনপ্রাকৃতজনেন ভবেয় বাসঃ।

পরে পুরোহিত, রাজা শুদ্ধোদনের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শুনিয়া শুদ্ধোদন ভাবিলেন এখন কুমার স্বয়ংই স্বচক্ষে দেখিয়া কন্যা নির্ব্বাচন করুন। ইহাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই ব্যাপার সহজে সম্পাদিত হইবার জন্য আমি অশোকভাণ্ড সকল প্রস্তুত করাইতেছি। কুমার স্বয়ংই স্বহস্তে এই সমস্ত ভাণ্ড কন্যাগণকে বিতরণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে যিনি সর্ব্বাংশে তাঁহার নয়নানন্দদায়িনী হইবেন আমি সেই কন্যাকেই তাঁহার জন্য মনোনীত করিব।

অনন্তর রাজা শুদ্ধোদন নানারত্নময় অশোকভাণ্ড সকল প্রস্তুত করাইলেন, এবং কপিলবস্তু নগরে এইরূপ ঘণ্টাঘোষণা করিয়া দিলেন, রাজকুমার অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে দর্শন দিবেন এবং স্বহস্তেই কন্যাদিগকে অশোকভাণ্ড সকল দান করিবেন। অতএব ঐ দিবস সংস্থাগারে কন্যাদিগের উপস্থিতি আবশ্যক।

পরে সপ্তম দিবসে রাজকুমার সংস্থাগারে গিয়া এক রত্নখচিত সুশোভন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই অবসরে নগরের যাবতীয় কন্যা তাঁহাকে দর্শন এবং অশোকভাণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য ঐ সংস্থাগারে আসিতে লাগিল। কুমার একে একে সকলকেই অশোকভাণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এমনই পবিত্র জ্যোতি এমনই অলৌকিক প্রভাব যে উহাদের মধ্যে কেহই তাহা সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা অশোকভাণ্ড লইয়া সত্বরই তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ইতিপূর্ব্বে রাজনিয়োগে পুরোহিত যে কন্যাকে মনোনীত করিয়া আসিয়াছিলেন তিনি শাক্যবংশীয় দণ্ডপাণির কন্যা,নাম গোপা। সুরূপা গোপা দাসীগণপরিবৃতা হইয়া যথায় রাজকুমার উপবিষ্ট সেইস্থানে একটু অন্তরালে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নির্নিমেষ লোচনে দেখিতে ছিলেন। যখন বিতরণ প্রসঙ্গে সমস্ত অশোকভাণ্ড নিঃশেষিত হইয়াছে তিনি সেই সময়ে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া সস্মিত মুখে কহিলেন, কুমার, আমি এমন কি তোমার নিকট অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার অবমাননা করিলে। রাজকুমার কহিলেন না, আমি তোমার অবমাননা করি নাই। এখন অশোকভাণ্ড সমস্তই নিঃশেষিত এবং তুমিও সর্ব্বশেষে আসিয়াছ। এই বলিয়া তিনি স্বহস্ত হইতে বহুমূল্য এক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া উহাঁকে অর্পণ করিলেন। কন্যা কহিলেন রাজকুমার তোমার নিকট আমি এইরূপই প্রার্থনা করি। এই বলিয়া অঙ্গুরীয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

পরে রাজা শুদ্ধোদন প্রচ্ছন্নচারী পুরুষের দ্বারা স্বপুত্রের শাক্যকন্যা গোপার প্রতি প্রীতি সঞ্চার হইয়াছে শুনিয়া কন্যার পিতা দণ্ডপাণির নিকট পুরোহিতকে প্রেরণ করিলেন, কহিয়া দিলেন তোমার কন্যাকে আমার পুত্রে অর্পণ কর। শুনিয়া দণ্ডপাণি কহিলেন, আর্য্য, রাজকুমার কেবল ভোগসুখে প্রতিপালিত হইয়াছেন।

কিন্তু শিল্পজ্ঞকে কন্যাদান করা আমাদের কুলধর্ম্ম। রাজকুমার কোনও রূপ শিল্প জানেন না এবং যুদ্ধবিদ্যাতেও নিপুণ নহেন। অতএব রাজাকে বলিবেন উক্ত রূপ গুণসম্পন্ন পাত্র না পাইলে আমি কদাচ কন্যা দান করিব না।

ক্রমশঃ।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, কার্ত্তিক মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১৬৬৸/৩
পূর্ব্বকারস্থিত	...	২৬৪৫ ৵৩
সমষ্টি	...	২৮১১৸৶৬
ব্যয়	..	২৮ /০
স্থিত	...	২৭৮৩৸৵৬

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲	
দফে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত দুই কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	২০০০৲	
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সোলা পোষ্ট বিল এক কেতা	১৩৮৵৩	
	২১৩৮৵৩	
		২৬৩৮৵৩
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু		৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত		১৩৮৸০
		২৭৮৩৸৵৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	৩৪৷৵০

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন রায়	১০৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ	২৪৲
পুরাতন সংবাদ পত্র বিক্রয়ের মূল্য	॥৵০
	৩৪৷৵০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৮॥/০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা		১৲
" " যদুলাল মল্লিক, ঐ		৩৲
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র দত্ত, ঐ		৩৲
" " হেমলাল পাইন, ঐ		৩৲
" " জানকীনাথ মজুমদার, ঐ		৩৲
" " বনমালী চন্দ্র, ঐ		৩৲
" " বলাইচাঁদ পাইন, ঐ		৩৲
" " কম্বুলাল বর্দ্ধন্, ঐ		৩৲
" " কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ঐ		৩৲
" " আশুতোষ ধর, ঐ		৩৲
" " ব্রজনাথ দত্ত, ঐ		৩৲
" " আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, ঐ		১৲
" " কুঞ্জবিহারী দেব, ঐ		২৲
" " ক্ষেত্রমোহন ধর, ঐ		১৲
" " দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ঐ		৩৲
" " গোপালচন্দ্র দে, ঐ		১৲
" " গোবিন্দলাল দাস, ঐ		৩৲
" পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঐ		৩৲
" মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর, ঐ		৩৲
" মহারাজা বাহাদুর অব্ দিনাজপুর		৩৷৵০
" পণ্ডিত দয়ালচন্দ্র শিরোমণি, কোন্নগর		৷/০
" বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত, ঢাকা		৮৲
		৫৮॥/০
পুস্তকালয়	...	৪৷৶৬
গচ্ছিত	...	৬৮॥৵৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		॥০
সমষ্টি		১৬৬৸/৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৩ ৵৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৩৷৶৩
পুস্তকালয়	...	৷/৬
যন্ত্রালয়	...	১৶৯
সমষ্টি		২৮/০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপিসর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

অষ্টষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

গত ভূমিকম্পে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ ভগ্নপ্রায় হওয়ায় শ্রীমন্মহর্ষি দেবের বাটীতে সাপ্তাহিক উপাসনা হইতেছিল। এক্ষণে গৃহের সংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ায় আগামী ১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় এই স্থানেই উপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

অষ্টষষ্টিতম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

হে প্রিয় ব্রাহ্মগণ!

১১ই মাঘের শুভ উৎসব দিনে তোমরা সকলে সংযম অবলম্বন করিও এবং আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিও। এই উৎসবের দিনে আমিষ আহার পরিত্যাগ করিয়া সংযম পূর্ব্বক শুদ্ধাচারে থাকাই প্রকৃষ্ট বিধি। তোমরা এইরূপ বিধি অবলম্বন করিলেই ব্রহ্মোৎসবের পবিত্রতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইবে।

শান্তিনিকেতনে সপ্তম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

৭ই পৌষ ৬৮ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

রাত্রিপ্রভাতে আমরা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালের সুমধুর

ভজন গীতে প্রবুদ্ধ হইলাম। গৃহের বাহির হইয়া দেখি নির্ম্মল সুশীতল বায়ু বহিতেছে। নানা জাতীয় পক্ষী বৃক্ষশাখায় মধুর স্বরে কোলাহল করিতেছে। রাত্রিশেষের অস্ফুট চন্দ্রালোকে কুজ্ঝটিকাবৃত দিগন্তের দ্রাঘিমা অল্প অল্প দেখা যাইতেছে। অনন্ত আকাশে ইতস্ততঃ দুই একটী ক্ষীণজ্যোতি নক্ষত্র। বড়ই রমণীয় সময়। আমরা কিয়ৎক্ষণ পাদচার প্রসঙ্গে প্রাভাতিক শোভা উপভোগ করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে অরুণরাগ জল স্থল ব্যোম রঞ্জিত করিয়া তুলিল। আমরা প্রাতঃস্নানাদি করিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রস্তুত হইলাম। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। ধূপধুনার সুগন্ধ সকলের মন পুলকিত করিয়া তুলিল। আমরা সমবেত হইয়া 'অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি' এই বন্দন গীতি গাহিতে গাহিতে ব্রহ্মমন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। এবং তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তিভরে সমস্বরে 'দেহজ্ঞান দিব্যজ্ঞান' এই প্রার্থনা সঙ্গীত শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিলাম।

অনন্তর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন নিম্নোক্ত রূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

"অদ্যকার এই উৎসব কোলাহলে আমরা যেন ইহা বিস্মৃত না হই যে, সাধক শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করিবেন। এইরূপ সুন্দর নিভৃত নির্জ্জন প্রদেশেই—চতুর্দ্দিকে ওষধি বনস্পতি পুষ্পিত কানন এবং সুদূর প্রান্তর—উপরে অনন্ত আকাশ মঙ্গল লোক হইতে মঙ্গল লোকে প্রসারিত—এইরূপ দেবসেব্য মনোরম স্থানেই সাধকেরা শান্তদান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন—যাঁহার দর্শনে অন্তঃকরণ হইতে পাপ মলিনতা প্রক্ষালিত হইয়া গিয়া সুনির্ম্মলা শান্তির উৎস নিরন্তর উৎসারিত হইতে থাকে। অতএব এই উৎসব ক্ষেত্রে যাঁহারা সমাগত হইয়াছেন তাঁহারা একান্ত মনে পরমাত্মার প্রতি মনঃসমাধান করুন—যিনি সত্যের সত্য মঙ্গলের মঙ্গল আত্মার আত্মা সংসার সাগরের একমাত্র ভেলা—সর্ব্বজগতের পিতা মাতা এবং সুহৃৎ সেই মহান্ পুরুষের প্রতি মনকে স্থিরভাবে নিবিষ্ট করুন এবং তাঁহার আনন্দরস পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাদের মধ্য হইতে বিবাদ কলহ এবং অশান্তি দূরে নিক্ষেপ করিয়া পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করুন—একদিনের জন্য এইরূপ করুন তাহা হইলে কেহই এখান হইতে শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাইবেন না—পরম পিতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রতিজনের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া তাঁহাদের সকল দুঃখ নিবারণ করিবে; করুণাময় পরমেশ্বর আমাদের সকলের প্রতি তাঁহার প্রসাদ বারি বিতরণ করুন।"

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বাভিপ্রায় এইরূপে ব্যক্ত করিয়া ব্যাখ্যান পাঠ করিলেন।

"যিনি মহতো মহীয়ান আমরা ক্ষুদ্র হইয়া তাঁর কথা কি বলিব। জানি না; তাঁর কথা কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায়ই বা শেষ করিব। আমাদের বাক্য সম্পূর্ণই নিস্তব্ধ। এতক্ষণ যে তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া কৃতার্থ হইলাম তাহা ভারতের প্রাচীন ঋষিবাক্যে। যাঁহারা ধ্যানযোগে তাঁহাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন এতক্ষণ আমরা যে সেই সকল ঋষিদিগের জ্বলন্ত নিশ্বাসে আপনাদের নিশ্বাস মিশাইতে

পারিলাম ইহাতেই আমরা ধন্য। এখানে আমরা নিজের কথা কিছু বলিতে আসি নাই এ বিষয়ে আমরা বস্তুতই দুর্ব্বল। এক্ষণে যে ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ দিব তাহাও ঋষিবাক্যে। যিনি এই নির্জ্জন প্রশান্ত তপোবনে ভগবচ্চিন্তায় সিদ্ধকাম হইয়াছেন, যাঁর কৃপায় এই ভারত আবার ব্রহ্মনামে জাগ্রত হইয়াছে, যাঁর এই মহতী কীর্ত্তি তাঁরই অগ্নিময় মহাবাক্যে। ঋষিবাক্য প্রাচীন হইলেও চিরনূতন। সকলে ভক্তিসহকারে অবহিত হইয়া শুন এতকাল যাহা পাও নাই ইহাতে তাহাই মিলিবে।”

পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এই উপদেশ দিলেন।

“যাহা কিছু সান্ত তাহা ঈশ্বর নহে, যাহা দেশে কালে পরিচ্ছিন্ন তাহা ঈশ্বর নহে, যিনি জ্ঞানে প্রেমে সদ্ভাবে সসীম তিনি ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বর অনন্ত অগম্য, অপার অসীম। এই ত ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। কিন্তু কে সেই অনন্ত দেবকে বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারে; কয়জনেই বা তাঁহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা পায়? এই যে অনন্ত আকাশ পরিধিরূপে আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, এই যে অগণ্য তারকাখচিত নীলিমা চন্দ্রাতপের ন্যায় দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত রহিয়াছে, এই যে তরঙ্গাকুল মহাসমুদ্র উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে ছুটিতেছে, কেই বা তাহাদের অসীম ব্যাপকতা সম্বন্ধে প্রকৃত প্রস্তাবে আলোচনা করে, কেই বা তাহাদের অবলম্বনে সেই অনন্ত দেবকে ধরিতে প্রয়াসী হয়।

এই খানেই তোমার আমার সহিত প্রকৃত সাধকের প্রভেদ। আমি হয়ত দূরবীক্ষণ যোগে আকাশবিহারী গ্রহ-উপগ্রহের দূরত্ব স্থির করিব, নক্ষত্রাবলীর সংখ্যা নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইব, পরিমাপক রজ্জুতে সমুদ্রের অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য্য ও তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার পরিমাণ করিব। আমার বহির্ম্মুখী জ্ঞানের ধারাই এই। কিন্তু এই সকল অনন্তের ছায়া যাহা আমার সম্মুখে বিরাজমান, জ্ঞানোন্নত সাধক কেবল তাহাদেরই সাহায্যে আপনার অন্তশ্চক্ষুকে সমুজ্জ্বল করেন, এবং সেই সমুজ্জ্বল দৃষ্টি-প্রভাবে সেই অনন্তদেবকে সন্দর্শন করিবার উপযুক্ত হয়েন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্ফুলিঙ্গ কোথা হইতে বিনির্গত হইল, যদি দেখিতে চাও আমার সঙ্গে আইস। ঐ দেখ মহাত্মা রামমোহন রায় তরুণ বয়সে হিমালয় উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, অভ্রভেদী উন্নততম চূড়ার উপরে তাঁহার দৃষ্টি সন্নদ্ধ; ভয়ে বিস্ময়ে তটস্থ হইয়া বলিতেছেন, যিনি হিমাচলসমন্বিত সমগ্র জগতের স্রষ্টা পাতা বিধাতা তিনি অসীম অনন্ত দেব—মৃত্তিকা-ধাতু-প্রস্তর-মূর্ত্তি নহেন—তিনি অমূর্ত্ত অশরীরী।

আবার কোন বিরাট হৃদয়ের সাধনার বলে সেই বিস্ফুলিঙ্গ—নিষ্কলঙ্ক স্থায়ী তেজোরাশি রূপে জগতের সমক্ষে আবির্ভূত হইল, তাহাও যদি জানিতে চাও, তবে সেই ঋষিজীবনের সামান্য পরিচয় দিব।

বহুকাল ধরিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনা-ক্ষেত্র এই শান্তিনিকেতনে থাকিয়া বিশাল প্রান্তরের সহিত হৃদয়ের তার মিলাইতেন। তাই সপ্তচ্ছদতলস্থ ঐ প্রস্তর বেদী উদ্যানকে পশ্চাতে রাখিয়া প্রান্তরের কূলে সংস্থাপিত! পরিপুষ্ট বৃক্ষরাজিসমন্বিত এই উদ্যানের পশ্চিমোত্তরে বৃক্ষের এত অল্পতা কেন,

তাহার কি সন্ধান রাখিয়াছ? মহর্ষি চির-কালই "সূর্য্যের অস্তমিত মহিমা" সন্দর্শনের পক্ষপাতী। যখন এই অংশের তরুলতা বিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার দৃষ্টি অবরোধ করিল, তিনি তৎসমুদয়ের উচ্ছেদ করিলেন। তিনি নগরের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া কেন এই বিজন প্রান্তরে আসিয়া আশ্রম স্থাপন করিলেন? তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, লোকের কথা নিবৃত্তি না পাইলে, ঈশ্বরের বাণী মনুষ্যের কর্ণে আসিয়া পেঁৗছে না। উদাস প্রান্তরের ভিতরে প্রাচীর-বিহীন এই স্বচ্ছ মন্দির কেন বিনির্ম্মিত হইল? তিনি উপলব্ধি করিলেন, যে এইরূপ প্রান্তরের বিশালতাকে চক্ষের উপর ধরিয়া মুক্ত-হৃদয়ে মুক্ত-কণ্ঠে মুক্ত-স্থানে বসিয়া তাঁহার আরাধনা না করিলে সে উষ্মা তাঁহার চরণতল স্পর্শ করে না। লৌহ-প্রস্তরে কেন এই উপাসনামণ্ডপ গ্রথিত হইল, ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মনুষ্যের ব্যাকুলতা ইহা অপেক্ষা দৃঢ়তর উপাদান আর কোথায় পাইবে। যতদিন শরীরে বল ছিল, তিনি সেই অনন্তদেবের সন্ধানে পর্ব্বত-পাথার গহন-কান্তার ঘুরিয়াছেন, এখনও সেই শ্রান্ত-দেহ প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য্যের উদীয়মান রক্তচ্ছবি অনুরাগভরে প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে অবলোকন করে। বর্ত্তমানে একভাবে ইহাও তাঁহার সাধনার এক অঙ্গ।

আমরাত সকলেই ব্রাহ্ম। কিন্তু দীক্ষার দিন কে কবে স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেরই ত বর্ষগ্রন্থি জন্মতিথির হাস্যোল্লাসে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু সাধকের ভাব অন্যরূপ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই দিনে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—প্রকৃত দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাই জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার অন্তে মুক্তির পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইয়া, পরীক্ষালব্ধ সত্য ধর্ম্ম ও সাধনালব্ধ ঈশ্বরের সাক্ষীস্বরূপ এই মন্দির এইখানে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সাধকের হৃদয়—তাঁহাদের কার্য্য বিশ্লেষণ কর, সেখানে এমন কিছু দেখিবে, যাহাতে বাস্তবিকই তুমি স্তম্ভিত হইয়া যাইবে; এবং আপনার দুর্ব্বলতা দেখিয়া ততই মর্ম্মাহত হইবে। আমরাও যে সংসার ছাড়িয়া বৎসরান্তে দুই একদিনের জন্য এই বিশাল প্রান্তরে আসিয়া মিলিত হই, তাহা হইলে আমাদিগকেও নিতান্ত রিক্তহস্তে ফিরিতে হইবে না। বলিতে কি সেই অনন্তদেবের পূজার্চ্চনার জন্য এরূপ অনুকূল তীর্থভূমি বড়ই বিরল।

পরমাত্মন্! ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতির অনুরূপ এই বিশাল প্রান্তরে আসিয়া আজ তোমাকে অন্বেষণ করিতেছি, তুমি আমাদের সমক্ষে আবির্ভূত হও। বৈরাগ্যের কবচে আবৃত হইয়া আজ তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। দীনভাবে তোমার নিকট ক্রন্দন করিতেছি, তুমি নিজ হস্তে আমাদের অশ্রুজল মার্জ্জনা কর। অনন্যগতি হইয়া তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি, তুমি তোমার উদার-ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান দাও। মুমুক্ষু হইয়া তোমার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তুমি আমাদের বাসনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিম্নোক্তরূপ প্রার্থনা করিলেন।

"হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে

আত্মা দিয়াছ, বল দিয়াছ, তোমারই কৃপা বলে চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব কার্য্যে সক্ষম রহিয়াছে, তোমারই কৃপাবলে আমাদের মননশক্তি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তোমাকে অবলম্বন করিলেই আমরা অমৃতধামের—সেই শান্তিনিকেতনের অধিকারী হইতে পারি, তোমা হইতে বিচ্যুত হইলেই আমরা সংসারপ্রবাহে ভাসমান হইতে থাকি, অতএব তোমাকে ছাড়িয়া আমরা আর কাহাকে আত্ম সমর্পণ করিব? হে পরমাত্মন্! যাহাতে আমাদের সকলের ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাতে লয় পায়, যাহাতে আমাদের সকলের বুদ্ধি তোমার প্রিয় কার্য্যে নিয়োজিত হয়, যাহাতে আমাদের সকলের মন তোমাতেই সংযুক্ত থাকে, সেই শুভ আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে প্রেরণ কর। আমাদের চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ তোমার কার্য্যে অনুগত নয়, আমাদের ইচ্ছা সকল তোমার ইচ্ছার অনুকূল নয়, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল সংসারের নীচ সংকীর্ণ ভাব সকল পোষণ করিতেছে, তাই আমরা প্রতিদিন নীচতা হইতে নীচতাকে প্রাপ্ত হইয়া রোগ-শোক পাপতাপ বিবাদ বিসম্বাদ দ্বারা সংসারকে অশান্তিময় করিয়া তুলিতেছি। পশু, পক্ষী, কীটপতঙ্গ, দেব মনুষ্য ওষধি বনস্পতি সূর্য্য চন্দ্র বায়ু প্রভৃতি সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ তোমার নিয়মে অটল থাকিয়া যেমন নির্ব্বিঘ্নে আপনার আপনার কার্য্য করিতেছে, আমাদের সকলের ইচ্ছা যদি সেইরূপ তোমার ধর্ম্ম-কার্য্যে সতত পরত রত থাকিত, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে কি এত অসামঞ্জস্য, এত অমঙ্গল, এত দুঃখ দারিদ্র আসুরিক কার্য্য সকল স্থান পাইত? হে পরমাত্মন্! দিব্যধামবাসী দেবতারা যেমন একমনা হইয়া তোমার ইচ্ছা সম্পাদন করিতেছেন, এই পৃথিবীতেও যেন সেইরূপ আমরা তোমার ইচ্ছায় যোগদান করি, তাহা হইলে স্বর্গের ন্যায় এই পৃথিবীও শান্তিনিকেতনে পরিণত হইবে। আমরা তোমাতে আত্মসমর্পণ না করিয়া কেবল কতকগুলি নীচ মলিন বাসনা লইয়া আছি, কামনার উপভোগই জীবনের একমাত্র পুরুষার্থ মনে করিয়া ধনমান বিষয় বিভবের জন্য লালায়িত হইয়া বিব্রত রহিয়াছি। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, ধর্ম্ম হউক, অধর্ম্ম হউক, লোকের হিত হউক বা অহিত হউক— কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া যাহাতে আমাদের স্বার্থ সাধন হয় আমরা তাহাতেও প্রস্তুত তথাপি তোমার প্রতি লক্ষ্য করি না। সেই জন্য আমরা এই সংসারেই এত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। হে পরমাত্মন্! যাহাতে আমরা নীচ মলিন কামনা সকল বিসর্জ্জন দিয়া তোমাকে লাভ করিবার অধিকারী হই, আমাদিগকে সেই প্রকারে বলীয়ান কর। ব্রহ্মানুভূতি না থাকিলে আমাদের মধ্যে প্রকৃত সহানুভূতি জন্মাইতে পারে না। ব্রহ্মানুভূতির অভাবেই আমরা পরস্পর একমন একপ্রাণ হইতে পারিতেছি না। ব্রহ্মানুভূতির নিকট রাগদ্বেষ ঈর্ষা লোভ মোহ প্রভৃতি অনিষ্টকারী বৃত্তি সকল স্থান পায় না—ব্রহ্মানুভূতির সহিতই শান্তি বিরাজিত। অতএব হে পরমাত্মন্! আমরা একমন ও একপ্রাণ হইয়া তোমার নিকট করযোড়ে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়া শান্তি উপভোগ করিতে পারি সেইরূপ আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে প্রেরণ কর। যাহাতে আমরা তোমার ইচ্ছার অনুগত হই ও এই পৃথিবী যাহাতে

শান্তিনিকেতনে পরিণত হয় বারম্বার এই প্রার্থনা করি। ওঁ সবিতর্দুরিতানি পরাসুব, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।”

পরে সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইলে শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্র বাবু অনাথ দীন দরিদ্রদিগের জন্য সমস্ত্রক ভোজ্য উৎসর্গ করিলেন। অনন্তর আমরা সকলে মিলিয়া মহর্ষিদেবের সাধনস্থান সপ্তপর্ণমূলে উপস্থিত হইলাম এবং তথায় প্রস্তরনির্ম্মিত বেদির পার্শ্বে সকলে দণ্ডায়মান হইলে খোল-করতাল-যোগে মধুর ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন হইতে লাগিল। অনন্তর ত্রৈলোক্য বাবু একটী সংক্ষিপ্তরূপ প্রার্থনা করিয়া মধুর স্বরে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গাহিলেন।

মিশ্র মল্লার—ঝাঁপতাল।

ওহে শান্তিদাতা,
স্থান দাও শান্তিনিকেতনে।
পাপভারাক্রান্ত পরিশ্রান্ত পথিক জনে।
ভবদাবানলে প্রাণ, দহিতেছে অবিরাম,
কর পিতা শান্তি দান শান্তিবারি বরষণে।
স্নান করি শান্তিজলে, নিবারে বাসনানলে,
বসি শান্তি তরুতলে নিরখিব নিরঞ্জনে;
পাসরিব পাপ তাপ, বিরহ শোক বিলাপ,
হব পরিতৃপ্ত তব দরশনে পরশনে।
এ বিজন বনবাসে, অনন্তের সহবাসে,
ভাসিতেন মহোল্লাসে মহর্ষি আনন্দ মনে;
নাহি হেথা কোলাহল, শান্তিময় জল স্থল,
বহে শান্তি পরিমল সুবিমল সমীরণে।
শান্তিরস পান করি, গাই আজ প্রাণ ভরি,
শান্তি শান্তি শান্তি হরি মিলে সব বন্ধুগণে।

ঐ সপ্তপর্ণ বেদির নিকটে একটা তোরণাকার প্রস্তরফলকে ‘শান্তং শিবমদ্বৈতং’ খোদিত। কল্পনার চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ দেখিলাম যাঁহার সাধনার জন্য ঐ মর্ম্মরবেদি নির্ম্মিত সেই প্রশান্তস্বভাব মহাপুরুষ যেন তথায় ধ্যানমগ্ন। তিনি ধ্যানভঙ্গে চক্ষু উন্মীলন করিয়া মস্তকোপরি প্রসারিত অনন্ত আকাশে এবং সম্মুখে বলয়াকার বনচ্ছায়ায় নীলবর্ণ সুবিস্তীর্ণ দিগন্তে ভূমা ঈশ্বরের মহান ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আর অন্তরে যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতংরূপে বিরাজমান ঐ বাহ্য প্রস্তরফলকে তাঁহারই সেই স্বরূপ এক একবার পাঠ করিতেছেন। ফলতঃ স্থানটী দেখিয়া মন বড়ই উৎফুল্ল হইল। ঐ উদ্যানভূমির মধ্যে সর্ব্বাংশে সাধনের অনুকূল এমন নির্জ্জন নিস্তব্ধ প্রদেশ আর নাই। পরে ইতস্তত আরও দেখিলাম এক একটী স্তম্ভোপরি কোথাও বেদমন্ত্রের একাংশ, কোথাও ব্রহ্মসঙ্গীতের অল্পাংশ লিখিত। উদ্যানের অনেক স্থানে বৃক্ষমূলে সাধনবেদি এবং স্তম্ভোপরি লিখিত সাধন-সঙ্গীত। কাচময় মন্দিরের সম্মুখে একটী পুষ্করিণী আছে। তাহার মধ্যস্থলে একটা ধারাযন্ত্র মুক্তধারায় অনবরত জল উদ্গার করিতেছে। উহার চতুস্পার্শে বসিবার নানারূপ সুশোভন মঞ্চ, নানা-জাতীয় বিকশিত পুষ্পবৃক্ষ এবং স্তম্ভে স্তম্ভে হৃদয়াকর্ষক বৈরাগ্যসূচক নানারূপ সঙ্গীত। উহারই অদূরে সুদৃশ্য এক সাধনশৈল আছে। তাহার শিখরদেশে এক সুরচিত সমবৃত্ত পর্ণকুটীর, একটা ঘনচ্ছায় বংশীবট প্রকাণ্ড দুই শাখাবাহু দ্বারা আবৃত করিয়া যেন বাত বর্ষা প্রভৃতি নানারূপ উৎপাত হইতে উহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতেছে। আহা কি সুস্নিগ্ধ ছায়া। তথায় সতত নির্ব্বাধ সুনির্মল বায়ু বহমান, বৃক্ষে নানা জাতীয় পক্ষীর কলরব, কোথাও ময়ুর চন্দ্রকখচিত পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে, কোথাও বা হরিণ, যে

দিকে চাও প্রকাণ্ড মাঠ ও আকাশ ধূধূ করিতেছে। ঐ শৈলের পাদমূলে একটা সুগভীর খাদ। উহা বর্ষার জলে পূর্ণ হইলে বড়ই সুশোভন হয়। ফলত এই স্থানটী প্রকৃত সাধকের যথার্থই প্রীতিকর।

অনন্তর আমরা মাধ্যাহ্নিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে এক ভিখারিণী বেহালার সুরে কোমল কণ্ঠ মিশ্রিত করিয়া নিম্নোক্ত গানটী গাহিতে লাগিল।

ভেবে মরি কি সম্পর্ক তোমার সনে।
তত্ত্ব তার তত্ত্বাতীত হে,না পাই বেদ পুরাণে॥
তুমি জনক নও জননী, ভাই নও ভগিনী,
আত্মবন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যা,
তোমায় এ নহে, সম্ভব একি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবিনে।
শাস্ত্রে শুনতে পাই আছ সর্ব্ব ঠাঁই
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে।
তুমি হবে কেউ আমার, আপনার হতে
আপনার,আপনার না হলে মন কি টানে।

শুনিয়া বুঝিলাম স্থানমাহাত্ম্যে একটা সামান্য ভিখারিণীর গীতও আমাদের ভাবস্ফূর্ত্তির সম্পূর্ণ অনুকূল।

উদ্যানের বাহিরে নানাবিধ দোকান পসার আসিয়াছে। লোকে লোকারণ্য। কোথাও বালকেরা পুত্তলী ক্রয় করিবার জন্য মাতার অঞ্চল ধরিয়া টানা টানি করিতেছে। কোথাও নানারূপ সুশোভন কৃত্রিম ফলপুষ্প। দেখিলে বয়স্কেরও লইবার লোভ হয়। দলে দলে চীবরধারী বলিষ্ঠ সাঁওতাল পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীর ও বামহস্তে ধনুঃকাণ্ড লইয়া বিচরণ করিতেছে। কোথাও ভদ্র লোকেরা শোভন পরিচ্ছদে সেই বিপুল জনসম্মর্দ্দ মধ্যে বিক্রয়ার্থ আনীত দ্রব্যাদির শিল্পচাতুরী দেখিতেছেন। ফলতঃ আমরা সেকাল একালের এরূপ অদ্ভুত সংমিশ্রণ আর কুত্রাপি দেখি নাই। ঐ সময় অতি দূর দেশাগত বাউলের দেহাত্ম সংক্রান্ত সঙ্গীত আরম্ভ হইল। বড়ই ক্ষোভ হইতেছে এমন সুভাবপূর্ণ সঙ্গীতের একটাও পাঠকদিগকে উপহার দিতে পারিলাম না। এই সঙ্গীত শুনিয়া কি বিদ্বান কি মূর্খ সকলে সমভাবে আর্দ্রহৃদয় হইয়াছিলেন। যখন বাউলের দল গীতাবসানকালে ভাবে বিভোর হইয়া ঘন ঘন তুরীধ্বনির সহিত নৃত্য করিতে করিতে উদ্যান প্রদক্ষিণ করে তৎকালের দৃশ্য অতি বিস্ময়কর। উহাদের সহিত তথাকার ভদ্র লোকেরাও ভাবাবেশে উন্মত্তও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। সে কি আনন্দ! কি উচ্ছ্বাস! আমরা কখন তাহা বিস্মৃত হইব না। এই সময়ে ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে ত্রৈলোক্য বাবু এবং ব্রাহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পুত্র করুণা বাবু প্রভৃতি ভক্তেরা খোল করতাল ও একতারা যোগে সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধুর ও কোমল কণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীতে মোহিত না হইয়াছিল এমন লোক অতি বিরল।

চতুর্দ্দিকে খুব জনতা। উৎসব দর্শনের জন্য চারদিক হইতে লোক সমাগম হইতেছে। কি উৎসাহ! কি ঘোর কলরব! ক্রমে রক্তচ্ছবি সূর্য্য অস্তমিত হইল। সুপ্রশস্ত কাচময়-গৃহে নানাবর্ণের আধারে আলোক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এদিকে মঠাধ্যক্ষ স্বামী জী সাধকের মন পুলকিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। আমরাও ব্রহ্মোপাসনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

অনন্তর শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী নিম্নোক্ত প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

"পুত্র দারা ধন জন সমুদায়ই অনিত্য। এ সংসারের এই সকল প্রিয় বস্তুর সহিত কখন না কখন অবশ্যই বিচ্ছেদ হইবে, কিন্তু অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মার সহিত ইহকালে কি পরকালে কখন বিচ্ছেদ হইবে না। অনন্তকালই আমরা তাঁহার অমৃত ক্রোড়ে থাকিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকিব। চিরকালই তাঁহার বিমল আনন্দ উপভোগ করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিব, ইহাই আমাদের প্রতি তাঁহার মঙ্গল বিধান। তাবৎ জগৎ সংসার এই মঙ্গল অভিপ্রায়ের অধীন। কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের অনুগামী প্রবৃত্তি সকলেরই পশ্চাতে থাকিয়া বিষয়সুখেই প্রমত্ত, যৎকিঞ্চিৎ বিষয়সুখ প্রাপ্ত হইয়াই আপনাদিগের অতুল মহত্ত্ব কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা না জানিয়াই আপনাদের পরলোকের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করেন। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয়তম পুত্র এখানকার ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী সাধু মহর্ষিগণ ইহাঁদেরই মুক্তির জন্য, ইহাঁদেরই পথের অন্ধকার দূর করিবার জন্য কত প্রকার পরিশ্রম করিতেছেন, কত প্রকারে আত্মত্যাগ ও বিষয় বাসনার খর্ব্ব করিয়া লোকশিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে মন স্তম্ভিত হয়। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য দূরে যাইতে হইবে না, এই শান্তিনিকেতনই তাহার এক অভূতপূর্ব্ব জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। যে সাধু মহর্ষি এই পতিত বঙ্গদেশের উদ্ধারের জন্য উদ্যানের পুষ্পস্বরূপ, বৃক্ষের ফল স্বরূপ এবং ধর্ম্মের সারস্বরূপ ব্রহ্মোপাসনা ঘোষণা করিবার জন্য এই ৭ পৌষ দিনে সর্ব্বকল্যাণকর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারই তপস্যা ও পুণ্যপ্রভাবে এই নরমুণ্ড ও কঙ্করাচ্ছাদিত শ্মশানভূমি একণে পুণ্যতীর্থ ও ব্রহ্মোপাসনার পবিত্র ক্ষেত্র হইয়াছে। এখানে এখন নিত্য ব্রহ্মোপাসনা ও সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদিত হইয়া সকল মনুষ্যকে এই অনিত্য সংসার হইতে আকর্ষণ করিয়া সেই নিত্য-সুখময় ধামের দিকে লইয়া যাইতেছে। অদ্য ৭ পৌষ, এখানকার মহোৎসবের দিন। আমরা এখন এখানে ব্রহ্মোপাসনার জন্য সকলে সমবেত হইয়াছি। এস, আমরা আমাদের সকল বিষয়কামনা, সকল পাপ, সকল সংশয়-অন্ধকার এই ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হই এবং সেই শুভসঙ্কল্প পরমেশ্বরের শুভ অভিপ্রায় সাধন করিয়া আপ্তকাম হই এবং তাঁহার ভক্তের সকল পরিশ্রম সার্থক করি।"

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা শেষ হইলে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত উপদেশ দিলেন।

"স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালন্তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং।

এই গ্রহ এই উপগ্রহ এবং এই পৃথিবীর পশু পক্ষী মানব নদী গিরি সমন্বিত সৃষ্টিকে কেহ কেহ স্বভাব বলিয়া ব্যক্ত করেন। কেহ বা মূঢ়তা বশতঃ ইহাকে কালেরই প্রভাব বলেন। কিন্তু ধ্যান যোগানুগত সত্যদর্শী ঋষির মহাবাক্য এই যে পরম দেবতারই এই মহিমা যিনি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই সুশোভন দৃশ্য জগৎ দর্শন করিয়া যদি কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে না পারে তো তাহার কারণ ইহা নহে যে ঈশ্বর আমাদের কাহারো নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন। জানা উচিত যে বাহিরের যে কোন বস্তু আমাদের যতই

নিকটে থাকুক না কেন ঈশ্বর তাহা হইতেও আমাদের অধিকতর নিকটে রহিয়াছেন। কিন্তু বাহ্য বস্তুতে আসক্ত ইন্দ্রিয়সকল আমাদিগকে মহা মোহে মুগ্ধ করিয়া ভগবান হইতে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় সমস্ত বিশ্ব যাঁহার ক্রোড়ে শায়িত রহিয়া তাঁহার অমৃত পানে জীবন ধারণ করিতেছে সেই পরম মাতা আমাদের কত আপনার তাহা অনুভব কর। যেখানে গভীর ঔদাস্য, নিবিড় অন্ধকার, সেখানেও তিনি জাগ্রত ও দীপ্যমান রহিয়াছেন। তিনি যেমন দুঃখ ক্রন্দনের মধ্যে থাকিয়া শান্তি বিধান করেনও অন্ধকারে দীপ্যমান থাকেন সেইরূপ এই আলোকমালার মধ্যেও প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছেন। তিনি মলয় সমীরণে থাকিয়া আনন্দ প্রবাহিত করেন। সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর মেঘ, বৃষ্টি, বজ্রের মধ্যে থাকিয়া শক্তি সঞ্চালন করেন এবং পুষ্পের মধ্যে থাকিয়া তাহাতে সুন্দর বর্ণ বিধান করেন; আবার সেই পুষ্পের গন্ধের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহার মধুর ভাবে জগৎকে মুগ্ধ করেন। তিনি স্বীয় কল্যাণময় ভাবে জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু প্রমাদী ও অবিবেকী মনুষ্যেরা এরূপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও সর্ব্বতঃপ্রাপ্য পরমেশ্বরকে একবারও স্মরণ করে না। তং সং প্রশ্নং ভুবনা যান্ত্যন্যাঃ। সকল বিশ্ব সেই এক পরমেশ্বরেরই প্রশ্ন করিতেছে, তাঁহারই পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত করিবার জন্য চেতন জীবগণের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে কিন্তু আমাদের এ প্রকার জড়স্বভাব যে আমরা তাহাতে বধির ও অন্ধ হইয়া রহিয়াছি। ঈশ্বর আমাদের চতুর্দ্দিকে আছেন, আমাদের অন্তরে আছেন, কিন্তু আমরা আমাদের অন্তর হইতে দূরে ভ্রমণ করি, স্বীয় আত্মাকে দর্শন করি না এবং তাহাতে সেই পরমাত্মার অধিষ্ঠানকে অনুভব করি না। জ্যোতির জ্যোতি, সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎস, পুরাণ, অনাদি অনন্ত ও সকল জীবের জীবন তিনি। যাঁহারা আপনাদিগের অন্তরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহাদের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু হায়! কয় ব্যক্তি শ্রেয়ঃপথে বিচরণ করিয়া, তত্ত্ববিৎদিগের উপদেশে কর্ণপাত করিয়া আপনাদিগের অন্তরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করে। এই সংসারের যে সকল আপাতমনোরম বস্তু তিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন তাহারা আমাদিগের মনকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। বিষয়ীর মন ক্ষণকালের নিমিত্ত বিষয় হইতে বিরত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিবার অবসর পায় না। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি কিন্তু তাঁহাকেই ভুলিয়া জীবন যাপন করিতেছি, এ কি সামান্য কৃতঘ্নতা! ঋষিরাই যথার্থ বুঝিয়াছিলেন যে,

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল হইতে প্রিয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব হইলে জীবন অপদার্থ হয়, জগৎ শূন্য হয়। এই সংসারের নিরর্থক পদার্থ সকল—অস্থায়ী পুষ্প, হ্রসমান স্রোত, ভঙ্গুর প্রাসাদ—ক্ষয়শীল বর্ণের চিত্র, দীপ্তিমান ধাতুর রাশি, উচ্চ পর্ব্বত, প্রসারিত সমুদ্র, অরণ্য ও প্রান্তর আমাদিগের মনে প্রতীত হয় বটে, তাহারা আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে বটে,

আমরা তাহাদিগকে সুখদায়ক বস্তু মনে করি বটে, কিন্তু ইহা বিবেচনা করি না যে, তাহারা আমাদিগকে যে সুখ প্রদান করে তাহা তিনি তাহাদিগের দ্বারা আমাদিগকে প্রদান করেন। রজনীর চন্দ্রমা, মধ্যাহ্নের দীপ্তিমান সূর্য্য, কাননের পুষ্প প্রভৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে তাহা সেই সুন্দর পরমেশ্বরেরই সৌন্দর্য্য। এই সকল সুন্দর বস্তু আপনাদিগের মধ্যে আমাদের দৃষ্টিকে এরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে তাহা অতিক্রম করিয়া আমরা সেই পরম সুন্দর পুরুষের পদতলে উত্তীর্ণ হইতে পারি না। তিনি এরূপ পরিশুদ্ধ ও মহৎ পদার্থ যে তিনি ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন, এই নিমিত্ত যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনাদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কেহ কেহ এমনও আছে যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে। এই সকল লোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উপনিষৎ বলেন যে,

"অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ"।

সেই ব্যক্তি নিতান্তই অসৎ হয় যদি সে ঈশ্বর নাই এইরূপ মনে করে। আপাততঃ প্রবৃত্তির তৃপ্তিকর যে সকল পদার্থ তাহাতেই যাহারা আসক্ত হয় তাহারা কি দুর্ভাগ্য! তাহারা সত্যকে ছায়া ও ছায়াকে সত্য জ্ঞান করে। হায়! যাহা কিছুই নহে তাহাই কি আমাদের সর্ব্বস্ব হইবে, এবং যাহা আমাদের সর্ব্বস্ব তাহা কি আমাদের নিকট কিছুই নহে? এই মরীচিকাবৎ বৃথা ও শূন্য পদার্থ-সকল অধঃস্থায়ী আমাদের এই অধম মনেরই উপযুক্ত। ব্রহ্মপরায়ণ ধীর ব্যক্তি সকল বস্তুতেই ঈশ্বরকে প্রকাশমান দেখেন—সকল ঘটনার সংযোগে সেই মহান্ ঈশ্বরের কল্যাণ ইচ্ছাই সংযুক্ত দেখেন। যে মুহূর্ত্তেই ঈশ্বরের পুণ্যজ্যোতি তাঁহাদের দিব্য চক্ষু হইতে তিরোহিত হয় তখনই কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠেন,

"নহি ত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে"।

হে ঈশ্বর, তোমা হইতে দূরে থাকিয়া প্রাণ আর কিছুতেই ধারণ করিতে পারি না। কিন্তু এই মনুষ্যজন্মগ্রহণ করিয়া যে তাঁহাকে দেখিল না সে কিছুই দেখিল না। তাঁহাতে যাহার আস্বাদ নাই সে কোন বস্তুরই আস্বাদ পাইল না। তাহার জীবন স্বপ্নস্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব বৃথা। আহা! সেই আত্মা কি অসুখী ঈশ্বরের জ্ঞানের অভাবে যাহার সুহৃৎ নাই, যাহার আশা নাই, যাহার বিশ্রামস্থান নাই। কি সুখী সেই আত্মা যে তাঁহাকে অনুসন্ধান করে, যে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। কিন্তু সেই পূর্ণ সুখী যাহার প্রতি ঈশ্বরের মুখজ্যোতি সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাঁহারই প্রীতিপূর্ণ কৃপাতে তাঁহাকে পাইয়া আপ্তকাম হইয়াছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরে শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব এই রূপে প্রার্থনা করিলেন।

"সূর্য্য অদ্য প্রাতে অমৃতের অধিকারিগণকে অমৃতোৎসবের মধ্যে জাগ্রত করিয়া এবং অর্দ্ধ পৃথিবীকে কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আহ্বান পূর্ব্বক অবশেষে আমাদের এই আশ্রম-প্রান্তরের পশ্চিম-দিগন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছে। এইক্ষণে ধরামণ্ডলের অর্দ্ধ ভূ-খণ্ড শ্রান্তি ও সুপ্তির ক্রোড়ে নিশ্চেতন, দিবসের কর্ম্ম-কোলাহল প্রশান্ত হইয়াছে, প্রকৃতি ধ্যান-মগ্না তপস্বিনীর ন্যায় রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে সমাসীনা; এই সেই

পবিত্র সময়, যে সময়ে আমরা সংসার-কোলাহলের ক্ষণিক অবকাশের মধ্যে মনঃকর্ণে শুনিতে পাই, তাঁহার নিত্য-নিঃশ্বসিত উদাত্ত ওঁকার-ধ্বনি গগন-মণ্ডলের ব্রহ্ম-রন্ধ্র ভেদ করিয়া লোক হইতে লোকান্তরে অনাদি কাল হইতে অন্তহীন কাল পর্য্যন্ত শাশ্বত আনন্দের পরিপূর্ণ গম্ভীর-স্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে ; এই সেই সময়, যে সময় আমরা ধ্যানচক্ষে দেখিতে পাই,

"যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে যত্রাধিসূর উদিতো বিভাতি"

সেই পূর্ণ পুরুষের পরম মঙ্গল-মূর্ত্তি সমস্ত অগণ্য গ্রহ চন্দ্র নক্ষত্র পরিব্যাপ্ত করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" রূপে বিরাজ করিতেছে; এই সেই সময়, যখন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতে থাকি, তাঁহার অপরিসীম শান্তি জননীর অঞ্চলের ন্যায় দিগ্‌দিগন্তরে বিস্তীর্ণ হইয়া সমস্ত-লোককে অভয়-বক্ষের সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে এবং সেই শান্তি আমাদের দুঃখ শোকের উপায় ও নিদ্রার ন্যায় ও মৃত্যুর নিস্তব্ধতার উপরে রাত্রির ন্যায় স্নেহাবনত হইয়া বিরাজ করিতেছে।

দিবসে সূর্য্যের আলোক আমাদের চক্ষের সম্মুখে এক সুবিশাল যবনিকা নিক্ষেপ করিয়া রাখে, সেই আলোকে কেবল এই ক্ষুদ্র পৃথিবী বৃহৎ হইয়া আমাদের চক্ষে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে, অনন্তলোক অন্তরালে পড়িয়া যায় ; তখন আমাদের ক্ষুদ্র সংসার সমস্ত জগৎ ব্যাপারকে দিবালোকের বহির্ভাগে দূরীকৃত করিয়া রাখে, এবং জগতে কেবল আমাদের কর্ত্তৃত্বই আড়ম্বরের সহিত সমুত্থান করে ; তখন ভ্রম হয়, আমরা এই পৃথিবীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ; অবশেষে সন্ধ্যার শ্রান্তি যখন আমাদের মাংসপেশীকে শিথিল এবং স্নায়ুজালকে অবসন্ন করিয়া আনে, যখন রাত্রির অন্ধকার নিঃশব্দে ও অনায়াসে আমাদের সংসারকে গ্রাস করিয়া ফেলে, যখন অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র-মালা তিমির-রাশির পর-প্রান্তে অনন্ত লোকের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র বিস্তার করিয়া দেয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি, দিবসে যে পৃথিবী আমাদের কাছে একমাত্র জগৎ হইয়া উঠিয়াছিল, সে এই বিশ্বজগতের মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ; বুঝিতে পারি—দিবসে যে আমি সর্ব্বময় কর্ত্তা, সে এক্ষণে অন্ধ—শ্রান্ত—সুপ্ত, শিশুর ন্যায় নিঃসহায়; কেবল একমাত্র 'রক্ষকং রক্ষকাণাং' নির্ন্নিমেষ-নেত্রে জাগ্রত থাকিয়া বিশ্বলোকে অবস্থান করিতেছেন।

এক্ষণে রজনীর মহান্ অন্ধকার দিবসের ক্ষুদ্র আলোক-যবনিকা উত্তোলন করিয়া দিয়াছে ; এক্ষণে দেখিতেছি,

"দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।"

একাকী তুমিই দ্যুলোক-ভূলোক-মধ্য ও দিক্‌পুঞ্জ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ,

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং। বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।"

তুমিই আদিদেব পুরাণ পুরুষ, তুমিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিধান, হে অনন্তরূপ! তুমিই সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞেয় ও পরমধাম, তুমিই বিশ্বভুবন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ।

বালক যেমন দিবসে ক্রীড়ার সময় মাতার কথা বিস্মৃত হইয়া থাকে, আবার সন্ধ্যা সমাগত হইলে, ক্রীড়া কৌতুক পরিহার করিয়া জননীর ক্রোড়েই আশ্রয় গ্রহণ করে, আমরা সেইরূপ দিবসে অনেক সময় সংসার-ক্রীড়ার ব্যস্ততায় তোমাকে

বিস্মৃত হইয়া থাকি, কিন্তু তুমি যে পরম স্নেহময়ী জননীরূপে বিশ্ব-জগতের অন্তঃপুর-মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে অহরহ আমাদের অজস্র মঙ্গল বিধান করিতেছ, হে বিশ্বজননি! তোমার সেই পরম-মঙ্গল সুমধুর-মাতৃ-ভাব উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইবার ইহাই আমাদের মাহেন্দ্র-ক্ষণ।

আমরা অদ্য শুভ-লগ্নে এই নির্জ্জন-প্রান্তরের প্রান্তদেশে এই পবিত্র শান্তিনিকেতনাশ্রমে সমাগত হইয়াছি; তুমি আমাদের অদ্যকার এই রজনীর উৎসবকে সার্থক কর! এই বিপুল জন-সমাগমের মধ্যে সফলতা প্রেরণ কর। তোমার 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং আনন্দরূপং' এই দীপালোকিত মন্দির হইতে ঐ তারালোকিত গগন-প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদ্ভাসিত করিয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হউক।

অনাদ্যনন্তং করুণৈকসিন্ধুম্,
পরং মহান্তং ভুবনৈকবন্ধুম্।
বিভুং শিবানন্দকরং পরেশম্,
নমামি তং শান্তিনিকেতনেশম্ ॥ ১ ॥
সর্ব্বার্থদং সর্ব্বগুণাব্ধিমাত্মম্,
মোক্ষ-প্রদং সর্ব্বশুভৈকবীজম্।
বিশ্বার্চ্চিতং বিশ্বজনৈকনাথম্,
নমামি তং শান্তিনিকেতনেশম্ ॥ ২ ॥
সর্ব্বেশ্বরং শান্তিকরং বরেণ্যম্,
ধর্ম্মাবহং পাপনুদং শরণ্যম্।
সত্যামৃতং প্রেমময়ং মহেশম্,
নমামি তং শান্তিনিকেতনেশম্ ॥ ৩ ॥
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এই প্রার্থনা করিলেন।

"ব্রহ্মোৎসব রূপ শতদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আর আমরা আজি তার মধু সুখে পান করিতেছি। আজি অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র কে হৃদয়ের মধ্যে নিঃশব্দে বলিল, "বৎসগণ অগ্রে, আজি আমাকে দেখ; আজি যে তোমাদের উৎসব, আমি তোমাদের উৎসবে আজি সমস্ত দিন আবির্ভূত থাকিব"। তাঁরই কৃপায় সেই শুভ মুহূর্ত্তে তাঁর আনন্দময় রূপ দেখিলাম। জ্ঞানচক্ষুঃ তৃপ্ত হইল। চর্ম্মচক্ষেও এক নবতর আলো আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই আলোকের কি অলৌকিক মোহিনী শক্তি—কি ঐন্দ্রজালিক গুণ! এইত সূর্য্য নক্ষত্র ভূষিত নীলাকাশ, হরিদ্বর্ণরঞ্জিত দূর্ব্বাদল-শোভিত প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রতিদিনই দেখি, কৈ আজিকার মত সুন্দর ত তাহাদিগকে কখন দেখি নাই।

কে তাহাদিগকে এ সুন্দর সাজে সাজাইল, যিনি আমাদের চক্ষুকে আজি নব নব শক্তিতে সম্পন্ন করিয়াছেন, তিনিই কি আজি প্রকৃতিকে তাঁহার নিজের চক্ষের আলোতে আলোকিত, ও সৌন্দর্য্যে সজ্জিত করেন নাই? এ সব সৌন্দর্য্য—সব শোভা তাঁরই। আজি পশু পক্ষীদিগকে সুখে সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া, পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছে, তাহারাও বুঝি উৎসবের আনন্দভাগী হইতেছে। কপোতদিগকে আজি মাঠে সূর্য্যকিরণে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া মনে হইল, তাহারাও উৎসব উপলক্ষে যেন নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছে। বিহঙ্গমদিগের মধুর ধ্বনিতে আজি কার মধুর স্বর শুনিয়াছি? এ কি সেই মধুময়ের মধুর স্বর নয়? যাহা ভক্তিকর্ণ বিনা শ্রুতিগোচর হয় না। ফুলে আজি তাঁরই গন্ধ, রসনায় তাঁরই রস, ত্বকে তাঁরই স্পার্শ-সুখ অনুভব করিতেছি। তিনি যেন আজি সমস্ত শরীর ও আত্মায় বিশেষ রূপে

আবির্ভূত হইয়াছেন। কত যে তাঁর করুণা! কি বলিব বচন নাহি বলিবার! সে যে বাক্যাতীত করুণা! কি ক্ষুদ্র কীট আমরা আর কি মহান তিনি! কি পাপ-মলিনতা-পূর্ণ আমরা, আর কি পবিত্রতা-পূর্ণ তিনি! তথাপি আমরা অযোগ্য হইলেও, তিনি আমাদিগকে দর্শন দিয়া ও আপনাকে ভোগ করিতে দিয়া করুণার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রাণ এখন উদাস! আমরা উদাস প্রাণে বলিতেছি

"কি সুধাময় শোভা হেরিলাম,
হৃদয় দুয়ার খুলিয়ে।
ধন্য দরশন লাভ হোলোরে,
ধন্য তোমার করুণা।"

আমরা দুর্ব্বল জীব, এমন করিয়া তোমায় সব দিন দেখিতে পাই না।

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না।
কেন মেঘ আসে প্রাণে,
তোমায় দেখিতে দেয় না।
আঁখির পলকে যবে পাই দেখিতে,
সদা হারাই হারাই মনে হয় ভয়,
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ!
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে॥"

আমরা তোমার দর্শনের প্রার্থী। অনুক্ষণ কেমন করিয়া তোমায় হৃদয়ে রাখিব, হৃদয়ে দেখিব, তাহাই ভাবিতেছি। সংসার যেরূপ স্থান, তাহাতে সকল সময়ে এখানে তোমার হস্ত ধারণ করিয়া না থাকিলে, তোমায় চক্ষে চক্ষে না রাখিলে, তোমার কথা না শুনিতে পাইলে, তোমার ইঙ্গিত বুঝিয়া না চলিলে, ঘোর বিপদ, পদে পদেই বিপদ। আমাদের জ্ঞান নিতান্তই পরিমিত। আমরা সকল সময়ে সকল বিষয় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তোমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারি না! এই জন্য অনেক সময়ে সংকট হইতে সংকটে পতিত হই।

পূর্ব্বকালের ঋষিরা তোমার নিকট সতত শুভবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেন; আমরাও আজি তোমার নিকট শুভবুদ্ধি, প্রার্থনা করিতেছি, যদ্দ্বারা নিশ্চয়ই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ হইবে।

আমরা আজি সম্পূর্ণ রূপে তোমাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি, তুমি আত্মা-রথে রথী হইয়া ইহাকে সৎপথে ধর্ম্মের পথে তোমার প্রেমের পথে লইয়া চল। আমরা আপনার বলে কিছুই করিতে পারি না।

"আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার,
একমাত্র ভরসা করুণা তোমার।"

যখন আমরা তোমার অননুমোদিত পথে মোহ বা ভ্রমবশতঃ পদার্পণ করিতে উদ্যত হইব, তখনই তুমি ভিতর হইতে বলিও, "না" "ও পথে নয়"। ভাল করিয়া বলিও, বজ্রনিনাদে বলিও যেন বেশ করিয়া বুঝিতে পারি। স্বাধীনতা দিয়াছ বলিয়া, তখন আমাদিগকে ছাড়িয়া দিও না। তুমি পশ্চাতে না থাকিলে, স্বাধীনতা এখানে আমাদের ঘোর বিভ্রাট ঘটাইয়া দেয়। পুনর্ব্বার বলি—ব্যাকুলতার সহিত বলি, তুমি হৃদয় ও বুদ্ধিতে সতত আবির্ভূত থাকিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য বিষয়ে পরিচালিত করিও। কি ক্ষুদ্র আমরা,আমাদিগের বুদ্ধি হৃদয় স্বাধীনতা তোমার হস্তে না রাখিলে, আমরা একবারেই অন্ধ হইয়া যাই। পথ দেখিতে পাই না।

"অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণাসিন্ধু, কর করুণা-কণা দান"॥

এই আজি তোমার নিকট প্রার্থনা। এই হৃদয়-সিংহাসন তুমি স্বহস্তে রচিত করিয়াছ, নাথ! কেন না তবে তুমি সেখানে চিরস্থায়ী হইবে? কেন বিদ্যুতের ন্যায় কখন কখন সেখানে প্রকাশিত হইয়া লুকায়িত হও।

আমরা তোমার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া থাকি। তুমি আমাদের প্রার্থনা বাক্যে সায় না দিলে, আমাদের মনে হয়, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ। তখন কি নিদারুণ যন্ত্রণাই অনুভব করি। সকল অবস্থাতেই আমাদের তোমার নিকট প্রার্থনা করিবার অধিকার আছে। তুমি মনের কথা বুঝিয়া আমাদের সরল প্রার্থনা পূর্ণ করিও। তাহা হইলেই এ লোকে তোমাকে অনেক দেখা হইল। আমরা তোমার রুদ্র মূর্ত্তি দেখিলে বড় ভীত হই। সে মূর্ত্তি তুমি আমাদিগকে দেখাইও না। কেন দেখাইবে? যখন তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছি, তখন আর যেন দুঃখ তাপ না পাই। আমরা আবদার করিয়া তোমার নিকট আজি একটি বিশেষ প্রার্থনা করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া শ্রবণ কর। আমরা তোমার প্রেমরূপের নিতান্ত পক্ষপাতী। ঐ রূপ সর্ব্বক্ষণ দেখিতে বড় ভালবাসি। তুমি ঐ রূপে অনুক্ষণ আমাদের হৃদয়ে বিরাজ কর।

শাস্ত্রকারেরা বলেন, এই প্রেম-রূপ দেখিতে হইলে, নিরুদ্বেগ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। হে দেব! আমরা যেন কাহাকেও উদ্বেগ না দিই এবং কাহা হইতেও উদ্বেগ প্রাপ্ত না হই। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে নিরুদ্বিগ্ন করিও।

অনাথ-নাথ! কবে সে অবস্থা আসিবে, যখন তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিরুদ্বেগে আমরা তোমার প্রেম-মুখের দিকে চাহিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু-ধারা বিসর্জ্জন করিব। কবে নিশি দিন তোমার সঙ্গে কথা কহিতে শিখিব, কবে তোমার মনঃপ্রাণমুগ্ধকর অশব্দ-বাক্য শুনিয়া প্রেমমোহে মোহিত হইব। নাথ! তোমার বিরহে আমাদের সময়ে সময়ে কি দশা ঘটে, তাহা তুমি জান। সে অবস্থা যেন আর না ঘটে। তখন আহারে বিহারে শয়নে ও বন্ধুসমাগমে কিছুতেই সুখ-শান্তি থাকে না। কখন কখন এ অবস্থায় আমরা মৃতপ্রায় হই। বোধ হইতে থাকে এক অনন্ত অন্ধকাররাশিতে প্রবিষ্ট হইয়াছি। তুমি আমাদিগকে এ কঠিন যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিও। তুমি আমাদিগকে তোমার অমৃতময় মিলনের সুখে সুখী করিও। তোমাকে বক্ষে বক্ষে, চক্ষে চক্ষে রাখিতে পারিলে, সকল ভয় সকল শোক দূর হয়। তুমি অক্ষয় কবচ। তোমাতে হৃদয় আচ্ছাদিত থাকিলে, সংসারের চতুর্দ্দিক হইতে যে বিষাক্ত বাণ আসিতেছে, তাহা কিছুই করিতে পারে না। তুমি যদি হৃদয়-সরোবরে পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত থাক, তাহা হইলে কি সুখের অভাব থাকে? সে সুখ সামান্য সুখ নহে, সে ব্রহ্মানন্দরূপ জ্যোৎস্নায় আমাদিগকে সুখে সন্তরণ করিতে দাও। ব্রহ্মানন্দরূপ রস পান করিতে দিয়া আমাদিগকে দেবতাদিগের ন্যায় আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান কর। এ রসনায় যেন দিনরাত্রি ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে পারি। হৃদয়-তন্ত্রীতে তোমার শিব-নাম যেন মধুর শব্দে নিরন্তর বাজিতে থাকে। আমরা তোমার—তুমি আমাদের, এই মন্ত্রে তুমি আমাদিগকে দীক্ষিত কর। আমরা যেন প্রেমে তন্ময় হইয়া

তোমাতে ডুবিয়া যাই। সমস্ত জীবন যেন এই প্রকার তোমার অমৃতময় প্রেম-ময় হ্রদে ভাসিতে থাকি। তোমার অভয়চরণে নির্ভর করিয়া যখন আমরা ইহলোক পরিত্যাগ করিব, সেই একটি দিন। তখন তুমি মাতৃরূপে আমাদিগকে দর্শন দিও। সে গভীর অন্ধকারে এমন একটি স্নেহের আলো সম্মুখে ধরিও, যা-হাতে ভয়ের লেশ মাত্র আমাদের নিকট না আসিতে পারে। তুমি বক্ষে করিয়া আমাদিগকে তোমার আনন্দ ও অমৃত-ধামে লইয়া যাইও, কালের নিশ্বাসে যেখানে আনন্দের কুসুম মলিন বিবর্ণ ও মৃত হইয়া যায় না। না জানি কি সুখ-ময় স্থান সেই যেখানে পাপ নাই—পাপের যন্ত্রণা নাই, যেখানে বিবাদ নাই, বিদ্বেষ নাই, বিরহ নাই। কেবলি ভালবাসা, কেবলি ভক্তি, কেবলি প্রেম, কেবলই আনন্দ উদ্ভাসিত হইতেছে। যেখানে প্রেমের জ্যোতি কোন কা-লেই অস্তমিত হয় না। যেখানে দেবগণ সুস্পষ্ট রূপে তোমাকে নিরীক্ষণ করি-তেছেন, কি এক প্রেমের গানে আত্মহারা হইয়া তোমাকে গাইতেছেন—তোমার প্রেমের গান গাইয়া আকাশকে মধুময় অমৃতময় করিয়া তুলিতেছেন। যে খানে নিয়তই তুমি তাঁহাদের নয়নের তারা ও হৃদয়ের আলো হইয়া রহিয়াছ। হে দেব! তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপের কণা-মাত্র জ্যোতি আমাদের জ্ঞানচক্ষে বিশ্বাস চক্ষে আজি এমন করিয়া দেও, যাহাতে তোমার সেই আনন্দধামের হিরন্ময় জ্যোতি এ লোকে থাকিয়াই দেখিতে পাই। এই নাথ, তোমার নিকট আমা-দের আজি প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।”

অনন্তর মঠাধ্যক্ষ স্বামীজী দাঁড়াইয়া বেদমন্ত্রে একটী প্রার্থনা করিলে সুমধুর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল। পরে সমস্ত নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া চটচটা শব্দে বহ্নুৎসব পর্ব্ব আরম্ভ হইল। লোকতরঙ্গ মহা কোলাহলে ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। তৎকালে খধূপোদ্গত গোলকের বিচিত্র নির্ম্মল আলোকে সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কেবলই মস্তকরাজি দৃষ্ট হইতে লাগিল। কি ভীষণ জনতা! কি বিষম কলরব! সর্ব্বশেষে একটা তোরণে আলোকরচিত 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই কথাটী পরিস্ফুট-রূপে দেখাইয়া নির্ব্বিঘ্নে বহ্নুৎসব পর্ব্ব শেষ হইয়া গেল। এবারকার তীর্থযাত্রা সর্ব্বাবয়বে সকলের প্রীতিকর হইয়া-ছিল। বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে ও তত্ত্বাবধানে সকলেই বিশেষ সুখী হইয়া-ছিলেন! কাহারই কোনও বিষয়ে কিছু-মাত্র ক্লেশ হয় নাই।

সংবাদ।

আমরা ব্যথিত হৃদয়ে প্রকাশ করি-তেছি পাথুরেঘাটানিবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহ লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বহুকাল হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম অধ্যক্ষ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ছিলেন। ইহাঁর প্রাচীন রীতিক্রমে লিখিত সরল পদ্য সহৃদয় মাত্রেরই প্রীতিকর হইত। শ্রীমন্মহর্ষি দেব নাম-সাদৃশ্যে ইহাঁকে সখা বাবু বলিয়া আহ্বান করিতেন। ইনি এক-জন বিদ্বান ধার্ম্মিক মিষ্টভাষী ও অতিশিষ্ট স্বভাব ছিলেন। যিনি ইহাঁর সহিত এক-বার মাত্র আলাপ করিয়াছেন তিনিই

ইহাঁর হৃদয়ের মধুরতায় মোহিত হইয়াছেন। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি এখন যথায় গিয়াছেন তথায় পরম সুখ ও শান্তিতে অবস্থান করুন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮; অগ্রহায়ণ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	১১০১৮ ৯
পূর্ব্বকারস্থিত	...	২৭৮৩৮৶৬
সমষ্টি	...	৩৮৮৫॥৶৩
ব্যয়	..	১৭৯৩॥৶৩
স্থিত	...	২০৯২ ⁄০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ৫০০৲

দফে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ ১০০০৲

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সোলা পোষ্ট বিল এক কেতা ১৩৮৶৩

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত ৪১৬॥৶৯

১৫৫৪৸৶০

২০৫৪৸৶০

হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু ৭৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৩০৶০

২০৯২৴০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... .. ১০২৯॥৶৯

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ১০০৲

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ৩৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৲

এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ বিক্রয় ৯১৬॥৶৯

১০২৯॥৶৯

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ১২।০

৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা ১৲

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়, ঐ ৩৲

" " শ্রীশচন্দ্র মল্লিক, আন্দুল ৪॥০

" " গণেশপ্রসাদ লালা, রাজ দ্বারভাঙ্গা ৩।৶০

অগ্রহায়ণঃ মাসের পত্রিকা এক খণ্ড নগদ বিক্রয় ।৶০

১২।০

পুস্তকালয়	...	৮॥০
যন্ত্রালয়	...	৫০৮৴০
গচ্ছিত	...	॥০
সমষ্টি		১১০১৮৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৬৬২৴৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৫।৶০
পুস্তকালয়	...	২০।৶৯
যন্ত্রালয়	...	৮৫॥৶০
সমষ্টি		১৭৯৩॥৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্দশ কল্প।

তৃতীয় ভাগ।

ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৮।

৬৫৫ সংখ্যা　　　　　　　　　　১৮১৯ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

অষ্টষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ রবিবার, প্রাতঃকাল।

রক্তাভ সূর্য্য উদিত হইয়াছে, সুশীতল মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে এই সময়ে সকলে ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য দলে দলে সমাগত হইতে লাগিলেন। সকলে আনন্দে উৎফুল্ল, বর্ষোৎসবে প্রাণ ভরিয়া প্রাণের প্রাণকে ডাকিবার জন্য উন্মুখ, এই অবসরে সুমধুর বন্দনা গান হইল। পরে ভক্তি-ভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শিবধন বিদ্যার্ণবকে সঙ্গে লইয়া বেদি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় গম্ভীর স্বরে সকলকে এইরূপে উদ্বোধিত করিলেন।

"আজ কিসের এত উৎসব আয়োজন। কেন আজ শতকণ্ঠে পবিত্র বেদগান ধ্বনিত হইতেছে। কোন্ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য আজ সকলে ব্যাকুল? বহু শতাব্দী পরে কে আবার বৈদিক সিদ্ধ মন্ত্রকে জাগাইয়া তুলিল? আমরা কি বাস্তবিকই বিপদের সম্মুখীন? এই অকাল বোধনে আর্য্যকুলদেবতার সিংহাসন সত্য সত্যই কি টলিয়া উঠিবে? আমরা উচ্চ কলরবে কেনই বা সকলের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছি?

আজ মাঘের একাদশ দিবস। আটষট্টি বৎসর অতীত হইতে চলিল, আজিকার শুভদিনে আরণ্যক ঋষিদিগের অরণ্যের ধন—তাঁহাদের সাধন-তপস্যা-লব্ধ অক্ষয় সম্পত্তি সজন নগরে আনীত হইয়াছে; ভারতের সেই পুরাতন গৌরব পুনঃ-প্রতিষ্ঠার সূচনা হইয়াছে, জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে, তাই আমাদের এই আনন্দ কোলাহল! একমেবাদ্বিতীয়ং অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনা, আত্মার মধ্যে পরমাত্মার সন্দর্শন, নিরবচ্ছিন্ন প্রীতিভক্তি-যোগে তাঁহার উপাসনা পদ্ধতি, যাহা বিলুপ্ত স্মৃতির ন্যায় এদেশ হইতে এককালে তিরোহিত হইয়াছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে সেই সুখস্বপ্ন অদ্যকার দিনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাই আমাদের আনন্দ-সরোবর উচ্ছ্বসিত! কোথায় আমরা অগণ্য দেবতার পশ্চাতে থাকিয়া বিবিধ বিধানে তাঁহাদের পূজার্চ্চনায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম, ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদ উপ-

নিষদের পত্র হইতে সেই এক ঈশ্বরের সন্ধান বলিয়াদিলেন; তাই আমাদের এত উদ্যম। ইতিহাসের অতীততম যুগের সহিত—সেই অতি প্রাচীন পূর্ব্বপিতৃপিতামহগণের সহিত, আমরা মমতার যে দুশ্ছেদ্য কোমল সূত্রে গ্রথিত, সিদ্ধ বেদমন্ত্রে আমাদের ব্রহ্মোপাসনাই, উহার অন্যতম নিদর্শন। কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সরস্বতী দৃষদ্বতী-তটে তাঁহারা সংস্কৃত পূতমন্ত্রে ঈশ্বরের মহিমা গান করিতেন, সেই দেবভাষা—মৃতভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি যখন আমরা "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" বলিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করি, "অসতোমা সদ্গময়" বলিয়া কাতর হৃদয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, আমরা যে এতই হীন, এতই নির্জ্জীব, আমাদের মধ্যেও প্রাচীন ঋষিগণের সেই ব্রহ্মানুভূতি—সেই অতুল্য বৈরাগ্য—সেই দুর্দম্য তেজ, বিদ্যুৎগতিতে ক্ষণিকের জন্য ফিরিয়া আইসে।

আমাদের অধঃপতনের আর কি অবশিষ্ট আছে। অন্তঃসার ত বহুদিন বিলুপ্ত, রহিয়াছে তাহার ছায়া। যদি চৈতন্যই থাকিত, তবে প্রতীকার-চেষ্টা আপনা হইতেই আসিত। বলিতে কি, বিজাতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সভ্যতা আসিয়া যদি এ দেশে সবেগে একটা আঘাত না করিত, তবে যাহাও কিছু দেখিতেছ, তাহারও বুঝি নিদর্শন মিলিত না। এ অবস্থায় ঈশ্বরই এই বিপদ-সমুদ্রের একমাত্র কাণ্ডারী, তাঁহার অমোঘ সাহায্যই আমাদের সর্ব্বস্ব। তাই আমরা তাঁহার করুণার ভিখারী হইয়া অকাল-বোধনে বরাভয় লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি; এবং সকলকে জাগ্রত করিয়া তাঁহার পদাশ্রয়লাভের জন্য মিনতি করিতেছি।

যদি কেহ বলেন, এদেশের পুরাণতন্ত্র সকলই ত বেদানুগ, তবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যুক্তি তর্ক ও বেদ উপনিষদের উপরে, ব্রাহ্মসমাজের এত নিষ্ঠা কেন? সংক্ষেপে তাহার উত্তর এই যে, পুণ্যসলিলা গঙ্গা হিমালয় হইতে বিনির্গতা হইয়া সাগরাভিমুখী হইলে তাহা নানা শাখা প্রশাখায় বিভিন্ন স্রোতে বিভক্ত হইয়াছে। স্থানভেদে উহার মধ্যে কোনটা বা পূতিগন্ধ, কোনটা বা লবণাক্ত, কোনটা বা বালুকাবহুল, অথচ মূলে তৎসমস্তই ভাগীরথীর সেই নির্ম্মল সলিল। কাল ও অধিকারভেদে পুরাণ ও তন্ত্রের অবস্থা ঠিক ঐরূপ। উহাদের মধ্যে এতই জটিলতা আবিলতা প্রবেশ করিয়াছে যে পুনরুত্থানকারীগণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও কষ্টকল্পনা ধর্ম্মের সেই প্রকৃতি-সুলভ সহজ সুন্দরভাব আনিয়া দিতে অক্ষম। একেই ত একতাবিহীন ভারতের অদৃষ্টবশে এক বেদ হইতে ন্যূনাধিক অর্দ্ধ সহস্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া দেশের ঘোর দুর্দ্দিন আনয়ন করিয়াছে! তাই আমরা সর্ব্ববিধ অকল্যাণ নিরাকরণের জন্য—বিগতবিবাদ ঈশ্বরকে লাভ করিবার আশয়ে, সকলধর্ম্মের মূলীভূত যুক্তিমূলক বেদ উপনিষদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়ের দিন স্মরণ করিয়া আজ আমরা সেই বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য পরমারাধ্য পরমদেবতার পূজার্চ্চনার জন্য সকলে মিলিত হইয়াছি। তাঁহার সত্তা আজ এখানে সকলে জাগ্রত জীবন্তরূপে অনুভব কর। ঐ যে তরুণ অরুণের রক্তচ্ছটা দেখিতেছ, উহা তাঁহারই সৌন্দর্য্যের ছায়া, প্রাভাতিক বায়ুহিল্লোলে তাঁহারই পবিত্র ভাব বিকীরিত, সমাগত সাধুসজ্জনের মুখশ্রীতে তাঁহারই আনন্দকণা

দেদীপ্যমান, নিখিলভুবন তাঁহারই সত্ত্বাতে পরিপূর্ণ।

যদি গতি মুক্তির ভিখারী হইয়া বিপথে পদচারণা করিয়া থাক, কর-যোড়ে আজ তাঁহার শরণাপন্ন হও তিনি তোমাকে সুপথে পরিচালিত করিবেন। যদি আত্মার ক্রন্দন নীরবে সহ্য করিতে না পারিয়া ম্রিয়মান হইয়া থাক, আজ তাঁহার নিকটে সঞ্জীবন-সুধা ভিক্ষা কর। যদি পাপে কলঙ্কিত হইয়া আপনাকে শোধনের অতীত জানিয়া হতাশ হইয়া থাক, তথাপি ভয় নাই, তিনি নিজহস্তে তোমার অশ্রুজল মার্জ্জনা করিবেন। ঈশ্বরের হস্তে জীবন সমর্পণ করিতে গিয়া যদি সংসারের প্রতিকূল তরঙ্গে বিক্ষোভিত হইয়া থাক, আজ তাঁহার চরণ-তরী আশ্রয় কর, তিনি তোমাকে অভয়কূলে স্থান দিবেন। যদি বিষয়-সেবাতে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাক, আজ শান্তপ্রাণে সেই অজেয় দৈব বাণী শ্রবণ কর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থল প্রকম্পিত করিয়া বলিতেছে "জাগিতে হবে রে, মোহনিদ্রা কভু না রবে চির দিন"। যদি বিদ্যাবুদ্ধির প্রাখর্য্যে জগৎকে তুচ্ছ ভাবিয়া থাক, গত কল্য রাহুগ্রস্ত জ্যোতিষ্মান প্রখর সূর্য্যের ত পরিণাম দেখিলে! সেদিনকার ভীষণ ভূমিকম্পে পৃথিবীর স্থৈর্য্য ত বুঝিলে। তোমার এই সপ্তবিতস্তি পরিমিত দেহের উপর—তাহার বিদ্যাবুদ্ধির উপর আবার আস্থা কি? "প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে সন্ধান আসে ফিরে তিনি হে অকিঞ্চনগুরু।" কাতর প্রাণে দীন ভাবে আজ তাঁহার চরণের দিকে অগ্রসর হও। হৃদয়ের সদ্য-প্রস্ফুটিত প্রীতি-কুসুম রাশিরাশি তাঁহার চরণে অর্পণ কর, শিক্ষা দীক্ষা তাঁহারই হস্তে লাভ করিয়া ভক্তিযোগে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, নয়নের অশ্রুদিয়া তাঁহার চরণতল বিধৌত কর, জীবনধন সকলই তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া আজ অক্ষয় অনন্ত ফল লাভ কর"।

অনন্তর স্বাধ্যায়স্ত উপাসনা পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীমৎ আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই উপদেশ দিলেন।

"সর্ব্বমঙ্গলালয় পরম পিতা পরমেশ্বর আমাদিগের অন্তঃকরণে জ্ঞান এবং ধর্ম্মের বীজ নিহিত করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই কিন্তু দুইই যাহাতে যথাকালে বিকসিত হইয়া পৃথিবীর মুখশ্রী সমুজ্জ্বল করিতে পারে এবং আত্মাকে পুণ্যজ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্‌ করিতে পারে তাহার জন্য তিনি নানা প্রকার দেশোপযোগী এবং কালোপযোগী বিধিব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন—সে সকল বিধিব্যবস্থা সার্ব্বভৌমিক মঙ্গল নিয়মের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। আমাদের এই দীনাশ্রুসিক্ত বঙ্গভূমিতে এক্ষণে শত শত বিদ্যালয় বিষয়-জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া কথঞ্চিৎ প্রকারে আমাদের বৈষয়িক উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে কিন্তু প্রকৃষ্ট জ্ঞান এবং ধর্ম্মের উন্নতি—যাহাতে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব হয় সেরূপ জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি—এক্ষণকার কোনো বিদ্যালয় হইতেই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আমরা আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি যে, একদিকে যেমন আমাদের দেশে বিষয়জ্ঞান এবং বিজ্ঞান উন্নতি লাভ করিতেছে আর এক দিকে তেমনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি নিতান্তই প্রার্থনীয়। কিন্তু পরম করুণাময় পরমেশ্বর যদি আমাদের প্রার্থনার পূর্ব্বেই আমাদের ভাবি প্রয়োজন

জানিয়া আমাদের মধ্যে সমুন্নত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ না করিতেন তাহা হইলে প্রকৃষ্ট জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি-আকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তঃকরণে কেবল আকাঙ্ক্ষা-মাত্রেই পর্য্যবসিত হইত, তাহার চরিতার্থতার কোনো উপায়ই আমরা দেখিতে পাইতাম না। উন্নত বিজ্ঞানের এবং বিষয়-জ্ঞানের সঙ্গে উন্নত জ্ঞান-ধর্ম্মের শিক্ষা না পাইলে বালকদিগের কোমল অন্তঃকরণ যাহা অমৃতের খনি তাহা ক্রমে ক্রমে কিরূপ বিষের আকর হইয়া উঠে এবং তাহাদের বয়োবৃদ্ধি-সহকারে কুপ্রবৃত্তি এবং স্বার্থ কিরূপ উদ্দাম হইয়া উঠিয়া পৃথিবীকে নরাকৃতি ব্যাঘ্র ভল্লুক এবং সর্পের আবাস করিয়া তুলে তাহা আমরা কঠোর পরীক্ষাতে চারিদিকে দেখিতেছি—দেখিতেছি যে, মনুষ্য গুরুজনের প্রতি ভক্তিহীন—ভ্রাতৃগণের প্রতি মমতা-বিহীন—আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিরক্ত এবং জন্মভূমির প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া ক্ষুধার্ত্ত হিংস্র জন্তুর ন্যায় সংসারারণ্যে দিবানিশি ভ্রাম্যমান হইতেছে; কিছুতেই তাহার দুষ্ট ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি মানিতেছে না। ইহা দেখিয়া এখনো কি আমাদের চেতন হইতেছে না!—স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম্ম যে ঈশ্বর-প্রেরিত এ বিষয়ে এখনো কি আমাদের মনে সন্দেহ পোষণ করিবার স্থান আছে? দুঃখ দুর্দ্দিনের নিশীথ-সময়ে যখন আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের বামে নিবিড় অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতেছে—দক্ষিণে শ্মশানভূমিতে ভূতপ্রেত পিশাচ নৃত্য করিতেছে, সম্মুখে একটি সুনিভৃত পরিষ্কার পথ প্রসারিত রহিয়াছে, তখনও কি আমরা সেই সম্মুখের বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করিতে ইতস্তত করিব? ব্রাহ্মধর্ম্ম যদিও পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তথাপি তাহা পুস্তকের ধর্ম্ম নহে—যদিও তাহা সম্প্রদায়ে উপনিবিষ্ট হইয়াছে তথাপি তাহা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নহে—ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম; ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার জীবন-স্বরূপ। ধর্ম্ম যদিও মনুষ্যের আত্মার স্বভাবসিদ্ধ সম্পত্তি, তথাপি তাহাকে রীতিমত পরিস্ফুট করিতে হইলে শিক্ষার নিতান্তই প্রয়োজন। কিন্তু সে শিক্ষা বিদ্যালয়-সুলভ বিজ্ঞান-শিক্ষা নহে। কেবল মাত্র বিজ্ঞান এবং বিষয়-জ্ঞানের শিক্ষাতে যতই ঐকান্তিক ভাবে লিপ্ত থাকা যায়, ততই জ্ঞানের সহিত ধর্ম্মের যোগ রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু বিজ্ঞানই যে জ্ঞানের সর্ব্বস্ব তাহা নহে। বিজ্ঞান কেবল জগতের বহিঃপরিচ্ছদের সন্নিধানবর্ত্তী কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাতে ব্যাপৃত হয়; তাহার ভিতরে যে আধ্যাত্মিক রাজ্য রহিয়াছে—বিজ্ঞান সেখানে কিছুতেই নাগাল পায় না। কেবল জগতের উপরি-স্তরের কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা অবগত হইয়া মনুষ্যের জ্ঞান কখনই তৃপ্ত হইতে পারে না। মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য কি—তাহাই মনুষ্য-জ্ঞানের প্রধান জিজ্ঞাসা। মনুষ্যই জগতের চরম অভিব্যক্তি; এই জন্য, যাহা মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্য তাহাই সমুদায় সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য এবং তাহাই সমস্ত কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার মূল প্রবর্ত্তক। সে চরম উদ্দেশ্য কি? নশ্বর বিষয় সম্বন্ধীয় আপাতদর্শী জ্ঞান এবং কলুষিত অনুরাগের চরিতার্থতা নহে—অবিনাশী পরমাত্মা সম্বন্ধীয় অন্তর্দর্শী জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ প্রেমের চরিতার্থতাই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই এক হস্তে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর এক হস্তে ব্রহ্মোপাসনা ধারণ করিয়া আমা-

দের নিদ্রিত আত্মাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" উত্থান কর জাগ্রত হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। যিনি আমাদের প্রসুপ্ত আত্মাকে জাগ্রত করিবার জন্য—তাপিত হৃদয়কে শীতল করিবার জন্য—মৃত শরীরে জীবন সঞ্চার করিবার জন্য অষ্টষষ্টিবৎসর পূর্ব্বে মাঘের একাদশ দিবসে আমাদের মধ্যে পরম পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়া শুষ্কতরু মুঞ্জরিত করিয়াছেন এবং মরুভূমিতে উৎস উৎসারিত করিয়াছেন, সেই পরমপিতা পরমমাতা এবং চিরন্তন সুহৃদের চরণে আজ আমরা সবান্ধবে মিলিয়া বার বার ভক্তিভরে প্রণিপাত করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি বেদির নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রার্থনা করিলেন।

"অন্তরের অন্তর, ডাকি তোমায়; ডাকি তোমায়, প্রাণদাতা; রাখ রাখ আমায়।

দুস্তর ভবার্ণবে তুমি ভেলা, অন্ধকার জগতের তুমি আলো।"

নাথ। আজি উৎসবের দিনে—আনন্দের দিনে—এই পবিত্র সঙ্গীত কুসুমাঞ্জলি আমরা ভক্তিপূর্ব্বক তোমার চরণে অর্পণ করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া গ্রহণ কর আমরা চরিতার্থ হই। এ অন্ধকারময় সংসারে কার মুখজ্যোতি আজি এখানে প্রকটিত হইয়াছে? আমরা কি আজি তোমারি মুখের স্নিগ্ধ আলোকে শরীর মন আত্মাকে শীতল করিতেছি না? যাহার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, যাহার আত্মা তোমার চরণ-সরোজে সংলগ্ন আছে, সেই জানিতেছে, তোমার এই আলোকস্পর্শ কি সুখাবহ! তোমাকে বক্ষে করিয়া কি আনন্দ-সুধা এখন পান করিতেছি তাহা কে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হয়? এই আনন্দই ঋষিদিগের সর্ব্বস্ব ছিল। সংসারাসক্তি পরিহার পূর্ব্বক কি আনন্দ-সুধাই তাঁহারা পান করিতেন। তপোবনে যে স্বর্গের ছায়া পড়িয়াছিল, সে কেবল তাঁহাদের ব্রহ্মানন্দের গুণে। আমরা, নাথ! আজি তোমার সেই আনন্দের প্রার্থী। তোমায় ছাড়িয়া এ সংসারে যে আনন্দ আছে, তাহা আনন্দ নামের যোগ্যই নহে। আমরা স্বার্থবিহীনা মাতার স্নেহ পাইয়াও তোমার বিশেষ স্নেহের আকাঙ্ক্ষা রাখি। পতিব্রতার প্রেম পাইয়াও তোমার প্রীতির জন্য লালায়িত হই। বন্ধুর অকৃত্রিম প্রণয় পাইয়াও তোমাকে সথারূপে অনুভব না করিলে কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। এখানকার ভাল জিনিসও যাহা আছে, তাহাও অপূর্ণ। তাহারাও সকল সময়ে সকল অবস্থাতে প্রাণে শান্তি দিতে পারে না। দয়াময়! তুমি আমাদের মোহ-আবরণ—মায়ার বন্ধন খুলিয়া দাও। স্থান দাও তোমার চরণ কমলে "কাতর মোদেরি প্রাণ, সংসারে, ওগো পিতা দাও তব চরণে স্থান"। আমরা সংসাররূপ ফুলে মধুপান করিতে গিয়া কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি, রুধিরধারায় স্নাত হইয়াছি। তুমি কোথায়, মঙ্গল হস্তে তাহা মুছাইয়া দাও। কত হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে রহিয়াছে কে তাহার ভেষজ হইয়া তাহা দূর করিবে? কত সময়ে আমাদের চক্ষু দিয়া শোকাশ্রু বহে, তুমি বিনা কে তাহা আর মার্জ্জনা করিয়া দিবে? কত সময়ে কত কঠিন কথা শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হই—তুমি বিনা কে সে মর্ম্মপীড়া

নিবারণ করিবে? এসংসারে যাহাদিগকে আমরা আপনার বলিয়া জানি, তাহারাও পর হয়, অতএব তুমি যে আমাদের আপনার হইতেও আপনার তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেও। তুমি বিবেক ও বৈরাগ্য দাও। সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিয়া তোমার প্রেমের পথে আকর্ষণ কর। "নাথ হে প্রেমপথে সব বাধা ভাঙ্গিয়া দেও, মাঝে কিছু রেখোনা, রেখোনা, থেকোনা দূরে। নির্জ্জনে সজনে, অন্তরে বাহিরে, নিত্য তোমারে হেরিব।" এই তোমার নিকট ভিক্ষা। কেমন করিয়া তোমায় দেখিব, কেমন করিয়া তোমার স্পর্শ-সুখ অনুভব করিব আমরা ভাবিয়াই আকুল, অথচ তোমাকে না পাইলেও এসংসারে প্রাণ বাঁচে না! জ্ঞান নাই, বুদ্ধি নাই, কোন শক্তি নাই—তথাপি বামনের চন্দ্র ধরিবার ন্যায় প্রাণ তোমাকে পাইবার জন্য আকুল, জানি না কি উপায়ে তুমি আমাদের আশা পূর্ণ করিবে। হে দেব! অন্ধকার এ সংসার তুমি বিনা। তুমি আমাদিগকে অন্ধকার হইতে পবিত্রতার জ্যোতিতে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যাও। তোমার তুলনা রহিত আনন্দের মধ্যে আনিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর! এই আমাদের তোমার নিকট প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

অনন্তর সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইল।

সায়ংকাল।

সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটী আলোকমালায় মণ্ডিত। সমস্ত স্থান লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। পরে শ্রীযুক্ত শিবধন বিদ্যার্ণব 'ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি' এই বেদমন্ত্রে শান্তিপাঠ করিলেন।

পরে এই বেদগান হইল।

"এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ।

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষামুহূর্ত্তাঅহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসামাসা ঋতবঃ সংবৎসরাইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

এতস্য বাঅক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যানদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাঃ।

যোবাএতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ যএতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সব্রাহ্মণঃ।

ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সংবৎসর; সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! অনেকানেক পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বতসকল হইতে স্যন্দমান হইতেছে।

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি এই অবিনাশী পুরুষকে জানিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মই অভয় ব্রহ্মই অভয়।"

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইরূপ বক্তৃতা করিলেন।

সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ।

কালচক্রের পরিবর্ত্তনে আবার আমাদের মাঘোৎসব উপস্থিত। যে বৎসর অতিবাহিত হয়েছে তার ঘটনাবলি আমাদের আশাপ্রদ নয়—এর মধ্যে কত শোক তাপ কত দুঃখ বিপত্তি আমাদের উপর দিয়ে গিয়েছে তার অন্ত নেই—

রাজার প্রতি প্রজাবিদ্রোহ, প্রজার প্রতি রাজবিদ্বেষ—

ভৌতিক উপদ্রব—অন্নকষ্ট—দুর্ভিক্ষ—মড়ক—ঝঞ্ঝার উৎপাত—ভূমিকম্প—

এই সকল অতিক্রম করিয়া আমরা এই উৎসবের দিনে পদার্পণ করেছি।—

যাঁরা এই উৎসবের আলোক জনকোলাহল সাজসজ্জা প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বরে বিমুগ্ধ তাঁরা এর যথার্থ মাহাত্ম্য, প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত নন।—

আজ আধ্যাত্মিক জগতে মনোনিবেশ কর। যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর—সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং—তাঁর সিংহাসন সমক্ষে আমাদের হিসাব দেখাবার দিন এই।—

কিরূপ হিসাব?—

আত্মার উন্নতি কতদূর সাধন করেছি—

ধর্ম্মবল উপার্জন—আত্ম-সংযমন—স্বার্থত্যাগ—পরোপকার ব্রতপালন—দেশের হিতসাধন—এতে কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছি।

মহাত্মা রামমোহন রায় এই বঙ্গভূমিতে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করে গিয়েছেন—যার প্রসাদে আমরা উপধর্ম্মের পরিবর্ত্তে সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের জ্ঞান লাভ করেছি—উপদেবতা পুত্তলিকার পরিবর্ত্তে সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মোপাসনায় অধিকারী হয়েছি, সে ধর্ম্ম কতদূর রক্ষণ ও পোষণে সক্ষম হয়েছি—শুধু মুখে নয় কিন্তু জীবন ও চরিত্রে—বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এই বীজ কত দূর বিক্ষিপ্ত করতে পেরেছি, সর্ব্বপ্রকার পৌত্তলিকতা উপধর্ম্ম কতদূর পরিত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছি—

এই হিসেব নিয়ে সেই দেবদেবের নিকট আমরা উপনীত—

এই সকল প্রশ্নের ভাল মন্দ উত্তরের উপর আমাদের ভাবি মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করছে।

এর যদি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি তা হলেই আমাদের মঙ্গল—তবেই ঈশ্বরের প্রসন্নতা ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে কৃতার্থ হব।

আর যদি দেখি এর কোন সন্তোষজনক উত্তর নাই, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই সাধিত হয়নি, পাপপ্রবৃত্তি আমাদের উপর জয় লাভ করেছে, মন্দ অভ্যাসে আত্মা এরূপ জড়িত হয়েছে যে তার হস্ত থেকে নিস্তার নেই, —পাপ তাপ শোকে বিষাদে জীর্ণ শীর্ণ

মুহ্যমান হয়ে রয়েছি তা হলে এ উৎসবের কি উপকারিতা, কি ফল? তাহলে এ উৎসবে আমাদের কোন অধিকার নাই, এ আমাদের পক্ষে কেবল নিরর্থক বাহ্য আড়ম্বর মাত্র।

দেখ আমাদের কি অধিকার!

যিনি সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং—যাঁর অঙ্গুলীর এক ইঙ্গিতে কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র আকাশপথে ভ্রাম্যমান, যে সূর্য্য আমাদের উত্তাপ, আলোক, জীবন প্রবাহের মূল, যার প্রকাশ দুমিনিট কাল গত হলে জগতে প্রলয়দশা উপস্থিত হয় (তার নিদর্শন আমরা কাল সূর্য্যগ্রহণের সময় কতকটা পেয়েছি) সেই সূর্য্য যাঁর আদেশে প্রত্যহ নিয়মিত রূপে উদয় হয়ে আমাদের এই পৃথিবীতে আলোক উত্তাপ বর্ণ সৌন্দর্য্য বিতরণ করছে—তাঁরই পূজার জন্য আমরা আজ তাঁর সিংহাসন সমক্ষে সমাগত।

আমরা কি সাহসে, কোন্ পুণ্যবলে তাঁর কাছে যাই—পদে পদে যাঁর আদেশ অবহেলা করেছি—যাঁর নিয়ম লঙ্ঘন করেছি।

এই মলিন পঙ্কিল হৃদয় নিয়ে কি সাহসে সেই তেজোময় মিহিরের সমক্ষে দণ্ডায়মান হই।

আমরা অতি ক্ষুদ্র, সেই অনন্ত স্বরূপের এক দিক মাত্র দেখতে পাই—এক একটি কিরণ কণা আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।—কোন কোন ধর্ম্মে সেই অনন্ত স্বরূপের কর্ত্তৃত্ব—তাঁর প্রভুত্ব—রাজপ্রতাপ এই ভাবটি বিশেষ রূপে পরিস্ফুটিত, যেমন মুসলমান ধর্ম্মে।—

আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে—

সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ—একটু প্রণিধান করে দেখুন এতে জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধ কতটা ঘনিষ্ঠ হয়। তিনি শুধু আমার রাজা নন—প্রভু নন—তিনি আমার সুহৃৎ।—

রাজদ্বারে উপস্থিত হলে আমাদের মনে ভয় হতে পারে—কিন্তু যখন তাঁকে আমার সখা বলে আলিঙ্গন দিতে পারি তখন ত তাঁর নিকটে যাওয়া দুঃসাধ্য বোধ হয় না। তিনি সখা, বন্ধুর নিকটে মনোবেদনা জানান ত কিছুই কঠিন নয়—তিনি আমার সখা—সমদুঃখসুখী, আমার উন্নতিসাধনে তিনি যত্নবান্—কিসে আমরা বিপদ সঙ্কট হতে উদ্ধার হতে পারি তার জন্য তিনি সমুৎসুক—তিনি আমার সুহৃৎ অতএব আমরা তাঁর শরণ ভিক্ষার অধিকারী।

আমরা যে সংসারে জন্মগ্রহণ করেছি তাতে আমাদের কি অবস্থা একবার পর্য্যালোচনা করে দেখ, বুঝতে পারবে তাঁর আশ্রয়ের প্রয়োজন কি না।

"এখানে নাহি কি পাপতাপ আছে যে
সুখেতে শয়ান"—

দেখ চারিদিকে কি জীবন সংগ্রাম কলহ!

প্রথমে, প্রকৃতিকে জয় করতে হবে নতুবা প্রকৃতি আমাদের উপর জয়লাভ করবে।

দাবানলে দেশ দগ্ধ হবে—জলপ্লাবনে গ্রাম পল্লী ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—ভূমিকম্পে সব ছারখার করে দেবে।

মনুষ্য সমাজের আদিম অবস্থা থেকে এই প্রকৃতির সংগ্রাম চলছে—ক্রমে আমরা জল বায়ু অগ্নির উপর আধিপত্য স্থাপন করেছি—ওষধি বনস্পতির গুণাগুণ পরীক্ষা করে আপনার কাজে এনেছি—ভূগর্ভ খনন করে রত্নোদ্ধার কচ্চি।

সমুদ্র, যার তরঙ্গরাজি দেখলেও ভয় হয়, তার উপর দিয়ে অনায়াসে গতিবিধি করছি; এমন সহজে এমন নির্ব্বিঘ্নে যে

আমাদের নিজ নিজ গ্রামে নিজ গৃহেও সেরূপ নয়; কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রকৃতির সকল শক্তির উপর আমাদের অধিকার নেই।

এক বৎসর বৃষ্টির অভাবে আমাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষের হাহারব উপস্থিত হয়—এমন কি আমাদের এই ক্ষুদ্র শরীর যার সংরক্ষণের জন্য আমরা এত কচ্চি তার উপরেও আমাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব নাই,আমরা এত ঔষধি প্রস্তুত করচি শারীরতত্ত্বের আলোচনা করচি তবুও ব্যাধির হস্ত এড়াতে পারি না।—

এই সঙ্গ্রাম নিয়তই চলেছে।

প্রকৃতির কথা যাক্, মনুষ্যসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর—দেখবে কতপ্রকার সামাজিক অমঙ্গলের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়।

যাঁরা সমাজসংস্কার বিষয়ে আলোচনা করছেন—সেই সংস্কারকার্য্যে যত্নবান্—তাঁরা দেখছেন আমাদের সামাজিক অবস্থা কিরূপ শোচনীয়, জনসমাজের হিতসাধন উদ্দেশে—কত প্রকার অনিষ্টকর সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্রধারণ করবার প্রয়োজন।

প্রথমতঃ স্ত্রীজাতির অধীনতা, শিক্ষার অভাব।—একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পারেন স্ত্রীজাতির উন্নতিতেই বাস্তবিক আমাদের জাতীয় উন্নতি নির্ভর করছে। অন্তঃপুরে জ্ঞান ধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ করতে হবে। মাতা যদি জ্ঞান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন তার সুফল পরিবার মধ্যে আপনা হতেই ফলিত হয়। আর মাতা যদি অশিক্ষিত কুসংস্কারপূর্ণ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকেন তার কুফল সমস্ত পরিবার মধ্যে বিস্তৃত হবে। আমাদের অঙ্গ পক্ষাঘাতে আহত হলে যেমন সর্ব্বশরীর বিকলতা প্রাপ্ত হয়—স্ত্রীজাতির হীনাবস্থায় আমাদের সমাজেরও সেইরূপ দুর্গতি। স্ত্রী পুরুষ মিলেই ত সমাজ।

তার পর জাতিভেদের নিয়ম দেখ—এই কঠোর নিয়মের বশবর্ত্তী হয়ে আমাদের স্বাধীনতার লোপাপত্তি হয়েছে—আমরা 'ছিন্নভিন্ন হীনবল' এই সন্ধি পেয়ে শত্রুদল সহজেই আমাদের পরাস্ত করলে, আমরা শত্রুহস্তে পতিত হয়ে নিজের মস্তক নিজ খড়্গাঘাতেই ছেদন করলুম। যে সময়ে এই জাতিভেদের নিয়ম হিন্দুসমাজে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় হয়ত এ প্রথা তখনকার সময়ের উপযোগী ছিল কিন্তু ক্রমে সে আমাদের সমাজে বদ্ধমূল হয়ে আমাদের প্রভূত অনিষ্ট উৎপাদন করেছে। এই নিয়মে জাতিতে জাতিতে বর্ণে বর্ণে মনুষ্যে মনুষ্যে পার্থক্য স্থাপিত হয়ে আমাদের পরস্পর হতে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেচে, সমাজের এক সম্প্রদায় মনে করছেন—আমিই বড় আর সকলে আমা অপেক্ষা নীচু, তাহাদের আমরা ঘৃণাভাবে কৃপাচক্ষে দেখি, তাদের ছায়া মাড়ালেও পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়—এ অপেক্ষা আমাদের জাতীয় দুর্গতি কি হতে পারে? একটু প্রণিধান করে দেখলে দেখতে পারেন এই নিয়মই আমাদের জাতীয় অধীনতা—জাতীয় অবনতির মূল। কেবল উদার ধর্ম্মবলে ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা এ ভাব কতকটা দমন করতে পারি—মনুষ্যজন্মের যে এক মর্য্যাদা আছে তা অনুভব করিতে পারি। আমরা সকলেই সেই অমৃতের পুত্র—অমৃতের সমান অধিকারী—রোগ শোক মৃত্যুর সমভাগী—তবে কেন আমি আমার ভ্রাতাকে হীনচক্ষে দেখি? আমরা উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে এই সত্যটি শিক্ষা করেছি—ঈশ্বর আমাদের পিতা আমরা তাঁ-

হার পুত্র, এই সত্যটি সার জেনে সকল ভ্রাতাকে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দে বন্ধন ও আলিঙ্গন কর।

আবার দেখ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের সমাজের কি হীনাবস্থা।—

এককালে ভারতবর্ষে যে সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচলিত ছিল ক্রমেই তার হীনাবস্থা হয়েছে—কালক্রমে আমরা কি অধোগতি প্রাপ্ত হয়েছি—আমাদের ধর্ম্ম কতকগুলি আচার মাত্র—মালাজপা, মন্ত্রপাঠ, তীর্থযাত্রা ও যাগযজ্ঞ এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানেই ধর্ম্ম।

এই সকল ক্রিয়াকাণ্ড ধর্ম্মসাধনের সহজ উপায়—আমি শুনেছি চীন জাতির মধ্যে একটী প্রথা আছে যিনি পাপ হতে নিষ্কৃতি লাভ ইচ্ছা করেন তিনি নিজ পাপের একটী তালিকা লিখে পুরোহিতের হাতে দেন, আর পুরোহিত সেইটি অগ্নিসাৎ করে ভস্ম করে ফেলেন—পাপী মনে করে আমার সকল পাপ বিনষ্ট হল।

তেমনি বৌদ্ধদের মধ্যে প্রার্থনা-চক্র। চাকা ঘুরিয়ে দিলুম আর মনে করলুম ঈশ্বরপ্রার্থনার যথেষ্ট ফললাভ হল।

আমাদেরও সেইরূপ। আমরা এই সকল সহজ অনুষ্ঠানকে ধর্ম্মসাধন মনে করি। আর আসল যা ধর্ম্ম তা কষ্টসাধ্য, আমরা সেদিক্ দিয়ে যাইনে।

আত্মসংযম, স্বার্থত্যাগ, কুপ্রবৃত্তি দমন, সত্যপালন, লোকোপকার-ব্রতধারণ, যা আসল ধর্ম্ম তার পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, ওসব ছেড়েদিয়ে আমরা সহজসাধ্য ধর্ম্মপথ অবলম্বন করি—গঙ্গাস্নান করে মনে করি কত পুণ্যই উপার্জ্জন করলুম! আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধিতে ঈশ্বর যে আদেশ প্রেরণ করছেন তার প্রতি আমরা বধির, আর কতকগুলি শাস্ত্রের বচন আমরা শিরোধার্য্য করে মানি। ধর্ম্মবুদ্ধির মন্ত্রণা তুচ্ছ জ্ঞান করে পরবাক্যের উপর নির্ভর করে চলি; এই নিয়ম অনুসারে আমরা নিরাকার নির্ব্বিকার পুরুষের ধ্যান ধারণা হতে নিরস্ত হয়ে আপন হস্তে পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করে, অনন্ত পুরুষকে সীমাবদ্ধ করে তাঁর পূজা করি। এই ধনপ্রাণ সৌন্দর্য্যময় জগতে কি জগৎপতির পরিচয় নেই, সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা গিরিগুহা কানন সেই সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী পরমেশ্বরের সাক্ষ্য প্রদান করে না যে এইরূপ বিকৃত কল্পনা ভিন্ন আমাদের গতি নেই? আমরা অসীমকে এইরূপে সীমাবদ্ধ করে আপনার সমকক্ষে নামিয়ে এনেছি—সত্যের উপর অসত্যের ছায়া আরোপ করেছি, স্বর্গকে পৃথিবীর ধূলির মধ্যে নামিয়ে এনে আপনাকে পুণ্যবান ও কৃতার্থ মনে করছি—আমাদের সমাজকে এই সকল দুর্গতি হতে উদ্ধার করতে হবে।

যাক্! সমাজ থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ আত্মার প্রতি দৃষ্টি কর।

প্রথমে দেখ অদৃষ্টের সঙ্গে আমাদের কিরূপ যুদ্ধ চলছে। কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ রুগ্ন, কেহ সুস্থ সবল হয়ে জন্মেছেন। দারিদ্র্য দুঃখের সহিত দরিদ্রের কি ঘোরতর সংগ্রাম করতে হয়! এমন কত শত লোক আছে যারা এক সন্ধ্যা আহার করে দিনপাত করছে, যাদের ঘরে পরদিনের অন্ন সংস্থান নাই, যাদের পরিশ্রমের ফল অন্যেরা ভোগ করছে, মহাজনের নিকট যারা ধন প্রাণে বাঁধা।

হে ধনবান সুখী লোক সকল—কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে! এই সকল দুঃখী ভ্রাতাদের কষ্টের প্রতি একবার দৃক্পাত কর—সে কষ্ট অনুভব করলে তোমাদের ভোগস্পৃহা কি তেমনিই বলবতী

থাকবে ? না তাদের সমদুঃখে অশ্রুপাত করে সাধ্যমত সাহায্য দানে তাদের কষ্ট-দূর করতে তৎপর হবে।

হে দরিদ্র! তুমি মনে করছ তোমার সধন প্রতিবাসীর কেমন সুখের অবস্থা, সে অবস্থা দেখে তোমার ঈর্ষা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক সে কি সুখী, তার কি কোন কষ্ট নেই ? সমাজের যে যত উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় তার উপর তত গুরুভার, তার তেমনি গুরুতর কর্ত্তব্য, তার উপর কতলোকের সুখ দুঃখ নির্ভর করছে। দারিদ্র্যের একরূপ কষ্ট ধনীর ভাগেও নানা দুঃখ কষ্ট বিপত্তি। আমরা প্রতি-জনেই এই অদৃষ্টচক্রে ঘূর্ণিত হয়ে যোঝাযুঝি করছি। এইত গেল অদৃষ্ট।

তারপর নিজ নিজ অভ্যাস। আমরা অভ্যাসের কিরূপ দাস! অবস্থা আমা-দের বহিঃপরিচ্ছদ মাত্র, অভ্যাসই আমা-দের শরীর। অভ্যাস সমষ্টিতেই আমাদের স্বভাব বিরচিত। যেমন সদভ্যাস গুণে আমরা সহজে সৎপথে ধর্ম্মের পথে প্রধা-বিত হই, তেমনি মন্দ অভ্যাসের ফলে আমরা অধোগতি প্রাপ্ত হই। মন্দ অভ্যাস গুলিকে বিসর্জ্জন না দিলে আমা-দের মঙ্গল নাই—

কেহ আলস্যের দাস
কেহ লোভ-পরবশ
কেহ পানাসক্ত।

কতবার প্রতিজ্ঞা করছি এ অভ্যাস ত্যাগ করব সে প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হচ্ছে—আ-মাদের শরীর মন ক্ষয় হচ্ছে—মস্তিষ্ক হীনবল হচ্ছে—আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করে ঈশ্বরের নিকট হতে অশেষ শাস্তি ভোগ করছি তথাপি আমাদের চেতনা হয় না, আমরা অভ্যাসের দাস হয়ে অপথে পরি-ভ্রমণ করি, অভ্যাস স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাড়তে পারি না।

এখন বহির্দ্দেশ হতে আরো অন্তরে প্রবেশ কর দেখতে পাবে আমরা প্রবৃত্তি-স্রোতে কিরূপ নীয়মান হই।

ইন্দ্রিয় সকল নানা দিকে ধাবিত হয়ে আমাদিগকে নানা দিকে আকর্ষণ করছে।

চক্ষু অস্থানে দৃষ্টিপাত করতে তৎপর।

কর্ণ পরনিন্দা শ্রবণের জন্য ব্যস্ত।

রসনা যে রসাস্বাদনের জন্য লালায়িত তা অতীব কটুরস, আপাতরমণীয় বটে কিন্তু পর্য্যন্তপরিতাপী।

উদর অতিমাত্র পানভোজনে উৎ-পীড়িত।

হস্ত পরদ্রব্য অপহরণের জন্য প্রসারিত। এই জীবন সংগ্রামে আমরা ব্যাপৃত—আ-মাদের কি সেই চিরসুহৃদের সাহায্যের প্রয়োজন নাই ?

আমাদের কি এতই বল, এমনি প্র-তাপ যে তাঁর সাহায্য বিনা এই ঘোরতর সংসার যুদ্ধে আত্মবলে আমরা জয়লাভ করতে সক্ষম, একথা যে কোন কার্য্যেরই নয় আমরা তা প্রত্যেকেই নিজে নিজে বুঝতে পারছি।

সেই সখাই আমাদের জীবনের এক-মাত্র আধার, আশ্রয়স্থান।

তিনিই ধর্ম্মের আবহ পাপের পরি-ত্রাতা। তিনি আমাদের প্রতিজনের হৃদয়ে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করছেন, সেই আদেশ শুনে চললে নিশ্চয়ই আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারি!

সাধু যার ইচ্ছা ঈশ্বর তার সহায়; আ-মাদের সাধু চেষ্টায় ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় তিনিই উৎসাহদাতা, অতএব হে ভ্রাতৃগণ! তাঁর শরণাপন্ন হও।

এখন তাঁর নিকট যাবার উপায় কি ?

তাঁতে আমাতে যে ব্যবধান আমাদের পাপ প্রবৃত্তি—পাপ বাসনাই তার মূল, সেই যবনিকা উত্তোলন করে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর দ্বারে আঘাত কর তিনি সে দ্বার মুক্ত করবেন।

তিনি ত দয়ার অবতার, ক্ষমার আধার। কথা হচ্ছে আমরা কখন্ সেই ক্ষমা লাভের অধিকারী হই?

যখন আমাদের পাপপ্রবৃত্তি বিসর্জ্জন করে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর কৃপাহস্তে আত্মসমর্পণ করি তখনি তিনি আমাদিগকে আলিঙ্গন করেন।

কিন্তু পাপ পরিত্যাগ করা চাই। সেই সর্পকে হৃদয়ে পোষণ করে রাখব আর তাঁকেও লাভ করব এদুই একত্রে হওয়া অসম্ভব। এদুই প্রভুর সেবা একত্রে হয় না, পাপবাসনা পরিত্যাগ কর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আপনা হইতেই হৃদয়ে স্পষ্ট অনুভব করবে। দৃষ্টান্ত—

ভৃত্য কর্ত্তৃক প্রভুর ধনাপহার। কখন সে ভৃত্য মার্জ্জনা পেতে পারে যখন সে ধন প্রত্যর্পণ করে অনুতাপিত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

সংবাদপত্রে একজনের মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে বেড়ানো। আদালতে গিয়ে মাপ চাইলেই কি তার মার্জ্জনা পাওয়া যায়? কখন্ পাই যখন আমরা নিন্দার দরুণ যে ক্ষতি করেছি যথাসাধ্য সেই ক্ষতি পূরণ করে নিন্দা প্রত্যাখ্যান করি তখন আমরা মার্জ্জনাযোগ্য, নতুবা মাপ চাওয়া বৃথা।

ঈশ্বরের নিকটেও সেইরূপ।

আমরা পাপবাসনা পরিত্যাগ করে অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি অবশ্যই আমাদের দোষ মার্জ্জনা করেন, তাঁর প্রসাদ বিতরণ করেন।

কখন জানতে পারি যে সম্পূর্ণ মার্জ্জনা পেয়েছি, যখন সেই আবরণ মুক্ত হয়, আবার তাঁর প্রসন্নতা হৃদয়ে অনুভব করি, আত্মপ্রসাদ পুনর্ব্বার ফিরে এসে আত্মাকে প্লাবিত করে তখন জানতে পারি ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা দূর হয়েছে, তিনি আমাকে এই পাপীকে ক্রোড়ে স্থান দিয়েছেন।

এই পরিবর্ত্তনশীল মৃত্যুময় সংসারে তিনিই একমাত্র ভরসা।

আমরা দুদিনের তরে যে সংসারে জন্মগ্রহণ করেছি এখানে কি দেখা যায়? সকলি অনিত্য, কিছুরই স্থিরতা নেই, লক্ষ্মী চঞ্চলা, সুখসৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী, অলক্ষ্মী ঘরে এলে আর ছাড়তে চায় না, চতুর্দ্দিকে কেবলই পরিবর্ত্তন।

নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হইতেছে।
নগর সকল পুরাতন হইতেছে।
রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইতেছে।
মাস ও পক্ষ অতীত হইতেছে।
শীত ও বসন্ত গমনাগমন করিতেছে।

বাল্য ও যৌবন তড়িৎ সমান তিরোহিত হইতেছে।

কাল ও মৃত্যু নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া চরাচর শাসন করিতেছে।

এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারমধ্যে সেই অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলস্বরূপই আমাদের ধ্রুবতারা—আমাদের একমাত্র নির্ভরের স্থান।

তাঁর উপর নির্ভর করলে আমরা নির্ভয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারি, আমাদের সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়, সকল ভয় দূর হয়, সর্ব্বসংহারক মৃত্যুও আমাদিগকে ভয় দিতে পারে না। অতএব হে ভ্রাতৃগণ! সেই জীবনসখার শরণাপন্ন হও।

আর সকলকে আমরা জয় করিতে পারি কিন্তু মৃত্যুর উপর আমাদের অধি-

কার নেই। এখন আমার জীবনের শেষ ভাগে উপনীত হয়েছি। আমার বাল্যবন্ধু যাঁদের সঙ্গে বাল্যকালে একত্র লালিত পালিত হয়েছি তাঁরা অনেকে দূরে গিয়েছেন, অনেকে পরলোকগত হয়েছেন—তাঁরাই শান্তিধামে গিয়ে বাস করছেন আর আমরা এই জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত থেকে অশান্তির মধ্যে কালহরণ করছি। আমার পা যদিও পৃথিবীর ধূলির সহিত মিশ্রিত কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসারের পরপার দৃষ্টিগোচর হচ্চে, সময়ে সময়ে মৃত্যুর আহ্বান শুনিতে পাচ্ছি, "এ পৃথিবীতে আর অধিককাল থাকতে হবে না, শীঘ্রই আমার সদনে আসতে হবে" কিন্তু আমাদের কি ভয়? আমরা যদি সেই মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস রেখে তাঁর উপর নির্ভর করে আমাদের জীবনের নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করে যাই, তাহলে আমাদের আর কোন ভয় নাই। এ মর্ত্ত্যলোকেও তাঁর রাজ্য, পরলোকেও তাঁর রাজ্য। এই দেহ যদিও ধূলির সহিত ধূলিসাৎ হয় আত্মা সেই অমৃত ধামের যাত্রী। আমরা সেই অমৃত নিকেতন প্রতীক্ষা করছি যেখানে গেলে আমাদের সুখ-শান্তির বিরাম নেই।

"কেবা জানে কত সুখরত্ন দিবেন
মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।"

সেই মৃত্যুর দিন যখন উপস্থিত হবে
"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর অন্যে
বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"

তখন আমরা সেই জীবনদাতার হস্তে আত্ম সমর্পণ করে নির্ভয়ে বলতে পারব—

জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু
নির্ভয় হইনু সখাহে
মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিয়ে
সহজে ত্যজিব এই দেহে।

পরে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বেদি গ্রহণ করিলেন। তানলয়সহকারে সঙ্গীত হইতে লাগিল, পরে উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সকলকে এইরূপে উদ্বোধিত করিলেন।

"অষ্টষষ্টিতম মাঘোৎসবের উপাসনা মণ্ডপে আমরা সেই পবিত্র স্বরূপ পরমাত্মার উপাসনার জন্য সমবেত হইয়াছি। এখানে তাঁহার কোন প্রতিমা নাই, কোন চিহ্ন নাই, কোন মধ্যবর্ত্তী নাই—এখন এখানে কোন যজ্ঞের অগ্নি-শিখাও প্রজ্জ্বলিত হইতেছে না। অবধান কর যে,

"ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যের্নশ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াৎ ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ। এষ ত আত্মা সর্ব্বান্তরোঽতোঽন্যদার্ত্তং।"

দৃষ্টির অন্তরে দ্রষ্টারূপে যিনি অবস্থান করিতেছেন চক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না, শ্রুতির অভ্যন্তরে শ্রোতা রূপে যিনি অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে কর্ণের দ্বারা শুনা যায় না, মনোবৃত্তির অভ্যন্তরে যিনি মন্তারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে মনন করা যায় না। কিন্তু জ্ঞানচক্ষে প্রেমপুলকিত দৃষ্টিতে অবলোকন কর এবং দেখ সেই নিরবদ্য মঙ্গলস্বরূপ চারিদিকে এই বাহ্য আলোকমালার মধ্যে আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করিতেছেন। এবং প্রত্যেকের আত্মাতে অন্তর্য্যামীরূপে থাকিয়া তাহাতে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার অধিকতর নিগূঢ় মহিমা এই যে, তিনি একই সময়ে অন্তর্বাহ্যে পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া আবার সকলের অতীত সেই ব্রহ্মধামে আপনাতে আপনি

অবস্থান করিতেছেন। এই পরম দেব-তাই আমাদের উপাস্য দেবতা। রোগে আর্ত্ত হইয়া যে মনুষ্য ক্রন্দন করে, অন্না-ভাবে ক্লিষ্ট হইয়া যে ব্যক্তি হা হতাশ করে এবং স্বজনবিয়োগে অন্ধতমসাবৃত হইয়া যে শোকানলে দগ্ধ হয় তাহার সকল দুঃখ দূর হয়, যদি সে এই ত্রিকালস্থ এবং ত্রিকালাতীত ত্রিভুবনপতি পরব্রহ্মকে আপনার অন্তরে আত্মস্থ করিয়া দেখে ও পবিত্র অন্তঃকরণে ভক্তিভরে তাঁহার উপা-সনা করে। এখনি ভক্তিভরে তাঁহার স্তুতিগান গীত হইল—এখনি সেই অরণ্য-বাসী মহর্ষিগণের মহা বেদগান সমস্ত আকাশকে ধ্বনিত করিয়া, সকল হৃদয়কে তাঁহার অনুরাগে জাগ্রত করিয়া এবং তাঁহার প্রেমসমীরণে সুশীতল করিয়া উত্থিত হইল। ইহার মধুর ধ্বনি লোক লোকান্তর ভেদ করিয়া পুণ্য লোকে প্রবেশ করিয়াছে এবং সেখানকার দেবা-ত্মাদিগকেও উদ্বোধিত করিয়া পরব্রহ্মের প্রতি প্রণত করাইয়াছে। এ কি! লোক লোকান্তরীণ, দেব মানবীয় উৎসবানন্দ! যাঁহার যোগে দেবতারাও এখন স্তিমিত-লোচন হইলেন আমরাও তাঁহার উপা-সনার জন্য উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেছি। অতএব এই অমৃতময় সময়ে সকলে শান্ত হও, দান্ত হও এবং উপরত ও তিতিক্ষু হইয়া সেই দেব মানবের সম্ভজনীয় পর-মেশ্বরের উপাসনাতে প্রবৃত্ত হও।

পরে স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই উপদেশ দিলেন।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং।

"অদ্য আমরা আনন্দরূপমমৃতং পরমা-ত্মার সাম্বৎসরিক পূজা মহোৎসবে সম্মি-লিত হইয়াছি। পরম পিতা পরমেশ্বরের সুমঙ্গল প্রসাদবারিতে এবং প্রিয় ভ্রাতৃ-গণের শুভ সম্মিলনে আজ আমাদের হৃদয়ে আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে! প্রীতিভক্তির ধূপধুনা চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে—সুমধুর তানমানলয়ে ব্রহ্মসঙ্গীত গগনে সমুত্থান করিতেছে। সত্যং জ্ঞান-মনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং শান্তং শিব-মদ্বৈতং ব্রহ্মনামের মহীয়সী শক্তি আজ আমাদের অন্তঃকরণে জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মে আমরা পাইয়াছি যে, সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং, সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না, শুভ কার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না। তাই আমরা আজ এই মহোৎ-সবের শুভ অবসরে সকল সত্যের মূল সত্য সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মের ধ্যান করিতেছি, প্রেমের মূল আকর আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রসাদবারিতে হৃদয়ের পিপাসা শান্তি করিতেছি, শান্তং শিব-মদ্বৈতং মঙ্গলময় পরমাত্মার বাৎসরিক উ-পাসনা সর্ব্ব-প্রযত্নে অনুষ্ঠান করিতেছি। আজ এই ভ্রাতৃ-সম্মিলনের অভ্যন্তরে শান্তং শিবমদ্বৈতং পরমাত্মার শান্তি এবং মঙ্গলভাব প্রেমানন্দে সমুজ্জ্বল হইয়া কেমন সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহা প্রাকৃত সৌন্দর্য্য নহে; তাহা আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য। এইরূপ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য সকল সৌন্দর্য্যের মূল আদর্শ। যাহাকেই আমরা সুন্দর দেখি তাহারই অভ্যন্তরে আমরা শান্তি এবং কল্যাণ দেখি—সে শান্তির আর এক নাম পরমাত্মাতে প্রতি-ষ্ঠিত ভাব এবং সে কল্যাণের আর এক নাম পরমাত্মার প্রতি প্রীতিভক্তি এবং সর্ব্ব জগতের প্রতি প্রীতি এবং সদ্ভাব।

পরমাত্মা সকল মঙ্গলের মূলাধার—পরমাত্মার স্বর্গীয় আনন্দ নিকেতনে কাহারো সহিত কাহারো বিরোধ নাই; সেখানে সকলেরই প্রতি সকলের প্রীতি এবং সদ্ভাব নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইতেছে; দেব-লোক-সকল শান্তি এবং কল্যাণের রাজ্য। সেই শান্তি এবং কল্যাণ হইতে যে এক সুমধুর ভাব উদ্ভাসিত হয় তাহাই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য। এই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের ছায়া অচেতন জড়-রাজ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে। সরোবরে সুকুমার পদ্মপুষ্প বিকসিত দেখিলে প্রথমেই আমরা তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হই—তাহার পরে ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে, সে সৌন্দর্য্য শান্তি এবং কল্যাণেরই অভিব্যক্তি। যাহাতে কাহারো চক্ষুঃপীড়া না হয় এইরূপ একটি মঙ্গল-ভাব পদ্মের অভ্যন্তরে অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিতেছে, আর, সেই মঙ্গলভাবের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের চক্ষু যেমনটি চায় পদ্ম সেইরূপ ভঙ্গীতে বিকসিত হইতেছে। সে মঙ্গলভাব অচেতন পদ্ম কোথা হইতে পাইল? তাহা পরমাত্মার মঙ্গল ভাবেরই ছায়া। যেখানে কাহারো সহিত কাহারো বিরোধ নাই—যেখানে শান্তি এবং কল্যাণ চির-বিরাজমান—পরমাত্মার সেই আধ্যাত্মিক অমৃত নিকেতন হইতে রসাকর্ষণ করিয়াই পদ্ম সুন্দর হইয়াছে। মনুষ্যের মনঃ প্রাণ চক্ষুর অভ্যন্তরে যিনি—পদ্মের অভ্যন্তরেও তিনি; মনুষ্যের মনঃ প্রাণ চক্ষুও পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত—পদ্মও পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত—তাই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সদ্ভাব। এইরূপ সদ্ভাবই শান্তি এবং কল্যাণের মূল। পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই শান্তি এবং চতুর্দ্দিকে শান্তি-বর্ষণের নামই মঙ্গল। সর্ব্বত্রই শান্তং শিবমদ্বৈতং পরব্রহ্ম জাগ্রত রহিয়াছেন বলিয়া অচেতন পদ্মও সচেতন মনুষ্যের হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করে—অচেতন পদ্মের অভ্যন্তরেও আধ্যাত্মিক মঙ্গল ভাবের ছায়া পড়িয়াছে। সমস্ত জগৎই মঙ্গলের ব্যাপার যেহেতু সমস্ত জগৎই শান্তং শিবমদ্বৈতং পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আধ্যাত্মিক মঙ্গল সমস্ত ভৌতিক জগৎ হইতে আর এক ধাপ উচ্চে অবস্থিতি করে;—জ্ঞানের সহিত এবং প্রীতির সহিত পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নাম আধ্যাত্মিক মঙ্গল, আর, আধ্যাত্মিক মঙ্গলের আভাই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য। সাধক যখন সুখ দুঃখে সম্পদ বিপদে নিঃসংশয় জ্ঞানের সহিত এবং আন্তরিক প্রেমের সহিত পরব্রহ্মে অটল রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ন তখন তাহারই নাম শান্তি, আর, যখন তিনি তাঁহার অন্তরের শান্তি জগৎ সংসারে বর্ষণ করেন তখন তাহারই নাম মঙ্গল। পৃথিবীতে ইহার বিপরীত দিক্‌ও আছে;—অবিবেকী মনুষ্য যখন সুখে উন্মত্ত হইয়া অথবা দুঃখে অভিভূত হইয়া পরমাত্মা হইতে বিচলিত হয় তখন তাহারই নাম অশান্তি, এবং সেই অশান্তি যখন অঙ্কুরিত এবং শাখায়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় তখন তাহারই নাম অমঙ্গল। শান্তং শিবমদ্বৈতং পরব্রহ্মে যিনি প্রতিষ্ঠিত তিনিই মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত, আর, তাঁহার অন্তঃকরণের মঙ্গলভাব হইতে যেরূপ আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য নিঃশ্বসিত হয় তাহা সকল সৌন্দর্য্যের মূল আদর্শ। পদ্মপুষ্পে এক প্রকার সৌন্দর্য্য—সমুদ্রে আর এক প্রকার সৌন্দর্য্য—সমুদ্র যখন ঝঞ্ঝাবাতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া গগন-মেদিনী রসাতলে দিবার মতো ভীষণ মূর্ত্তির ভান করে, তখন সেই উত্তাল তরঙ্গ-লীলার মধ্যেও

সমুদ্র আপন ভিত্তিমূল হইতে এক পদও বিচলিত হয় না। এইরূপ সমুদ্রের মহা উত্তেজিত এবং বিচলিত ভাবের মধ্যেও যখন তাহার মূল-স্থিত অটল শান্তি স্থৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য অভিব্যক্ত হয় তখন তাহা দেখিয়া আমরা মনোমধ্যে স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, অকূল মহাসাগর শান্তং শিবমদ্বৈতং পরব্রহ্মের উপরে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ অনন্তের উপরে অটলরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মহতী শান্তি এবং মহান্ মঙ্গল ভাবের পরিচায়ক; সেই মহতী শান্তি এবং মহামঙ্গল ভাব হইতে মহান্ সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হয় এবং তাহা দেখিলে আমাদের অন্তঃকরণ হইতে ভূমানন্দ উথলিয়া উঠে। অদ্যকার এই মহোৎসবে ভগবদ্ভক্ত সাধু সজ্জনগণের সহিত এই যে আমাদের শুভ সম্মিলন ইহার অভ্যন্তরে পরমাত্মার শান্তি এবং কল্যাণ কেমন সুবিমল শোভায় দীপ্তি পাইতেছে। আমাদের পরমারাধ্য পরম দেবতা—সর্ব্বমঙ্গলালয় পিতামাতা—বিশ্ববন্ধু ভক্তবৎসল প্রেমময় পরমাত্মা আজ আমাদের মধ্যে আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। বৎসরান্তে আজ আমরা সকল ভ্রাতায় একত্র সম্মিলিত হইয়া হৃদয়-থালভার প্রীতিপুষ্প-উপহারে অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মার অর্চ্চনা করিয়া কত না কৃতার্থ হইতেছি—তাঁহার প্রসাদে আজ আমরা সংসারের সমস্ত দুঃখতাপ বিস্মৃত হইয়া নূতন জীবন লাভ করিতেছি এবং তাহার নূতন আলোকে বিশ্বচরাচর নূতন সজ্জায় সজ্জিত দেখিতেছি। অদ্যাবধি যদি আমরা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের উপাসক হইয়া মুখে সত্য কাজে সত্য এবং অন্তঃকরণে সত্য হই; আনন্দরূপমমৃতং পরমাত্মার প্রসাদবারিতে হৃদয়ে আনন্দের সরোবর পরিপূর্ণ করিয়া রাখি—শান্তং শিবমদ্বৈতং পরমাত্মার আশ্রয়-বলে বলী হইয়া অব্যাকুলিত চিত্তে শুভকার্য্য অনুষ্ঠান করি এবং অশুভ কার্য্য হইতে দূরে থাকি—তাহা হইলেই আমরা এই ভয়াবহ সংসারে নির্ভয় মাতৃ-ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত হই। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা যদি সত্য স্বরূপ পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অসত্যের উপাসক হই—ধর্ম্ম হইতে এবং শুভকার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমঙ্গলের উপাসক হই, তবে আমরা আত্মার জ্যোতি এবং প্রাণ হারাইয়া ফেলিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হই; কেননা জ্ঞানময় সত্যই আত্মার জ্যোতি এবং প্রেমময় মঙ্গলই আত্মার প্রাণ। অতএব সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং—সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না—ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না—শুভকার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেক না। হে পরমাত্মন্! তোমার উপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া যাহাতে আমরা নিয়তকাল স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি—তুমি আমাদের প্রতি সেইরূপ প্রসাদবারি বিতরণ কর।”

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

“পরমাত্মন্! আমরা সম্বৎসর পরে আবার তোমার পাদমূলে মিলিত হইয়াছি। এই সম্বৎসরকাল তুমি আমাদিগকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমাদিগকে ক্ষুধার অন্ন দিয়াছ, রোগে কাতর হইলে ঔষধ দিয়াছ, শোক-বিকারে

মনে সান্ত্বনা দিয়াছ এবং বিপথে পদার্পণ করিলে দণ্ড দিয়া সৎপথে আনিয়াছ তজ্জন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে তোমাকে বার বার প্রণিপাত করি। আমরা ভীষণ সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন, ইহার তরঙ্গাঘাতে প্রতিপদে অস্থির, এখানে ধরিবার কিছু নাই। যাহা ধরিতে যাই, তাহাই প্রবাহবেগে ছিন্ন হইয়া যায়। নাথ! এই সঙ্কটে তুমিই আমাদিগের একমাত্র কাণ্ডারী। তুমিই আমাদিগকে এই বিভীষিকা হইতে প্রতিপদে রক্ষা কর, তজ্জন্য কৃতজ্ঞহৃদয়ে তোমায় বার বার প্রণিপাত করি। অনাথনাথ! আজ এই মহোৎসবের মধ্যে তোমাকে দেখিবার জন্য বড় আশা করিয়া আসিয়াছি, একবার দেখা দেও। কাতর হৃদয়ের মর্ম্মব্যথা তোমায় জানাইতে আসিয়াছি দয়া করিয়া একবার কর্ণপাত কর। আমরা তোমার হীন মলিন সন্তান, আমাদিগকে স্নেহ করিবার আর কেহ নাই, যে দিকে চাই ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া আসি, তাই আজ দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া দীন নয়নে তোমার মুখপানে চাহিতেছি তোমার কোমল ক্রোড়ে একটু স্থান দিয়া আমাদিগকে শীতল কর! অভাগা বলিয়া পরিত্যাগ করিও না। দেব! আমরা মৃত্যুভয়ে ভীত, যে দিন সকলে রোগশয্যার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া শোকাশ্রুর সহিত আমাদিগকে বিদায় দিবে, সেই দিন স্মরণ করিয়া কাতর হই, চক্ষের এই দুইখানি কবাট একবার পড়িয়া গেলে, পরে যে কি দেখিব, কিছুই জানি না; এই জন্য প্রাণের পিপাসা যে ইহ জীবনেই একবার তোমাকে দেখি। যদি ইহ জীবনেই তোমায় দেখিতে পাই, তবে ভবিষ্যতের ঘোর অন্ধকার আর আমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না, কারণ তুমিই সেই অন্ধকারের একমাত্র আলোক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

পরে এই সমস্ত ও অন্যান্য সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

রাগিণী কেদারা—তাল সুরফাঁকতাল।

উঠি চল সুদিন আইল
আনন্দ সৌগন্ধ উচ্ছ্বসিল।
আজি বসন্ত আগত স্বরগ হতে
ভক্ত-হৃদয়-পুষ্প-নিকুঞ্জে; সুদিন আইল।

রাগিণী মিশ্র সুরট—তাল একতালা।

এস হে এস,
বরেণ্য, সুমহান্, সহস্র সূর্য্য-বিভাস,
কর হৃদয় গগনে শুভ দিন বিকাশ!
এস হে এস!
তব পুণ্য কিরণে, বরণে বরণে
ফুটাও প্রেম-পুষ্প রাশ!
এস হে এস!
শত ললিত তানে, প্রভাত গানে
মোহনিদ্রা কর বিনাশ!
এস হে এস!
তব মাধুরী ভরিয়া, রাখহে এহিয়া,
পূরাও হে চিরজীবন আশ।
এস হে এস!

রাগিণী ছায়ানট্—তাল সুরফাঁকতাল।

ভক্ত হৃদ্‌বিকাশ প্রাণবিমোহন
নব নব তব প্রকাশ নিত্য নিত্য চিত্ত-গগনে হৃদীশ্বর।
কভু মোহ-বিনাশ মহারুদ্রজ্বালা
কভু বিরাজো ভয়হর শান্তি সুধাকর।
চঞ্চল হর্ষশোকসঙ্কুল কল্লোল পরে
স্থির বিরাজে চিরদিন মঙ্গল তব রূপ;
প্রেমমূর্ত্তি নিরুপম প্রকাশ কর, নাথ হে,
ধ্যান নয়নে পরিপূর্ণ রূপ তব সুন্দর।

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

কে বসিলে আজি হৃদাসনে ভুবনেশ্বর প্রভু,
জাগাইলে অনুপম সুন্দর শোভা হে হৃদয়েশ্বর।
সহসা ফুটিল ফুল মঞ্জরী শুকানো তরুতে
পাষাণে বহে সুধা ধারা।

রাগিণী সাহানা—তাল ধামার।

সুধাসাগরতীরে হে এসেছে নরনারী
সুধারস পিয়াসে।
শুভ বিভাবরী, শোভাময়ী ধরণী
নিখিল গাহে আজি আকুল আশ্বাসে।

গগনে বিকাশে তব প্রেম পূর্ণিমা,
মধুর বহে তব কৃপা-সমীরণ।
আনন্দ তরঙ্গ উঠে দশ দিকে
মগ্ন প্রাণ মন অমৃত উচ্ছ্বাসে।

রাগিণী আড়ানা—তাল ঝাঁপতাল।

নিত্য-সত্যে চিন্তন কররে বিমল হৃদয়ে
নির্ম্মল অচল সুমতি রাখ ধরি সতত।
সংশয়-নৃশংস সংসারে প্রশান্ত রহ
তাঁর শুভ ইচ্ছা স্মরি বিনয়ে রহ বিনত।
বাসনা কর জয়, দূর কর ক্ষুদ্র ভয়,
প্রাণধন করিয়া পণ চল কঠিন শ্রেয় পথে;
ভোল প্রসন্ন মুখে স্বার্থসুখ আত্মদুখ,
প্রেম-আনন্দরসে নিয়ত রহ নিরত।

রাগিণী আড়ানা—তাল কাওয়ালি।

লহ লহ তুলি লহ হে ভূমিতল হতে ধূলিম্লান এ পরাণ,
রাখ তব কৃপা চোখে, রাখ তব স্নেহ করতলে।
রাখ তারে আলোকে, রাখ তারে অমৃতে,
রাখ তারে নিয়ত কল্যাণে, রাখ তারে কৃপা চোখে, রাখ তারে স্নেহ করতলে।

রাগিণী লচ্ছাসার—তাল ঝাঁপতাল।

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা।
বাজে অসীম নভমাঝে অনাদিরব
জাগে অগণ্য রবিচন্দ্র তারা।
একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে
পরম এক সেই রাজরাজেন্দ্র রাজে;
বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত
লক্ষ শত ভক্তচিত বাক্যহারা।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, পৌষ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২১৮।/০
পূর্ব্বকারস্থিত	...	২০৯২ /০
সমষ্টি	...	২৩১০।৶০
ব্যয়	..	৪৮০॥৶০
স্থিত	...	১৮২৯৸০

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
দফে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	১০০০৲
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সোলা পোষ্ট বিল এক কেতা	১৩৮৶৩
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত	১১৬॥৶৯
	১২৫৪৸৶০
	১৭৫৪৸৶০
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৬৭৸৶০
	১৮২৯৸০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	১০২৲
মাসিক দান।		
শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		১০০৲
সাম্বৎসরিক দান।		
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত		২৲
		১০২৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫।০
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রদেব দাস,	কলিকাতা	৩৲
„ „ হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার,	ঐ	৩৲
„ „ বিপিনবিহারী বসু,	লক্ষ্ণৌ	১॥০
„ „ কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	রাজগঞ্জ	৩।৶০
„ „ শোভাইলাল ছোটলাল,	ভাবনগর	৪৲
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ,	শান্তিপুর	।৶০
		১৫।০
যন্ত্রালয়	...	১০০॥/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূল ধন		॥০
সমষ্টি		২১৮।/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	৪০৭।/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৬॥/০
পুস্তকালয়	...	॥৬
যন্ত্রালয়	...	৫৬৶৬
সমষ্টি		৪৮০॥৶০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৩ শে ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের অষ্টত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৭॥ ঘটিকার সময় এবং অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় উপাসনা হইবে। সঃ শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার।

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापिसर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

শকাব্দা ১৮১৯। ৪টা ফাল্গুন, বুধবার।

পাপের মূল।

ব্রহ্মোপাসনার প্রতিবন্ধক কি? পাপই ব্রহ্মোপাসনার প্রতিবন্ধক। শাস্ত্রকারেরা পাপের চারিটি মূল স্থির করিয়াছেন। যথা অজ্ঞান, শক্তিহীনতা, আলস্য এবং দুষ্ট স্বভাব।

যত অনর্থের মূল অজ্ঞান আর অজ্ঞান-জাত কুসংস্কার। অজ্ঞানই অন্ধকার। আর জ্ঞানই আলোক। অন্ধকারে মানুষ যেমন দেখিতে পায় না, অজ্ঞানেও তেমনি কি ভাল কি মন্দ বুঝিতে পারে না। মানুষ কিন্তু প্রথম বয়সে স্বভাবতই অজ্ঞান থাকে। তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় সকল বিকসিত হইয়া থাকে।

সম্মুখস্থ পদার্থ সকল তাহার ইন্দ্রিয় ও চিত্ত-দুর্গকে সর্ব্ব প্রথমেই অধিকার করিয়া লয়। এই জন্য সর্ব্বাগ্রে সে তাহাদের অধীন হইয়া পড়ে। ভুজঙ্গশিশু যে প্রাণহন্তা বালক তাহার কিছুই জানে না। সে তাহাকে সুন্দর বোধেই ধরিতে যায়। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কোন এক স্থানে কয়েক জন সৈনিক পুরুষ একটা বিষাক্ত ভুজঙ্গশিশু লইয়া খেলা করিতেছিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের আলোকের ন্যায় সে ক্রীড়া কৌতুক শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল। জন্মের মত ফুরাইয়া গেল।

যতক্ষণ এবং যে পরিমাণে মনুষ্য এই অজ্ঞানের বশীভূত থাকে, ততক্ষণ এবং সেই পরিমাণে, সে বালকের ন্যায় কার্য্য করে! সুতরাং সে বালক। অজ্ঞান হইতেই মনুষ্যের ঈশ্বরে অবিশ্বাস জন্মাইয়া থাকে। অজ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য ঈশ্বরের স্বরূপকে বিকৃত করিয়া বুঝে। অজ্ঞান হইতেই মনুষ্য স্বীয় ইষ্ট দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নরবলি দিয়া থাকে। অজ্ঞান-জাত কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া এক সময়ে ইংলণ্ডের সভ্যতাভিমানী লোক সকল ধর্ম্মান্ধ হইয়া জীবন্ত মনুষ্যকে অগ্নিতে দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়াছিল। অজ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়া মনুষ্য আপন পুত্রকে সাগরজলে নিক্ষেপ করিত।

আফ্রিকার বর্ব্বর জাতিরা আপন

আপন বৃদ্ধ পিতাকে মৃত্যুর পূর্ব্বেই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহার মাংস রন্ধন পূর্ব্বক আহ্লাদের সহিত আহার করিয়া থাকে। আদিম আমেরিকেরা মনে করে, যে যত শত্রু মারিতে পারে, তাহার জন্য স্বর্গে তত উৎকৃষ্ট স্থান মৃত্যুর পরে প্রস্তুত থাকিবে। তাহারা শত্রুর মাংস অগ্নিতে ঝলসাইয়া খাইতে বড় ভাল বাসে। ডন নদী তীরস্থ ডনকসাকেরা অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া অতি জঘন্য আচারের দাসত্ব করিত। সে যে কি দুরাচার তাহা বর্ণনার অতীত। আরো কত কত অকার্য্য যে এই অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে কে তাহার গণনা করিতে সমর্থ হয়? অতএব জ্ঞানালোচনা ও সৎসংসর্গ দ্বারা অজ্ঞান ও কুসংস্কার রূপ অন্ধকার হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা আমরা যেন হৃদয়ের সহিত করিতে যত্ন করি।

দ্বিতীয়, শক্তিহীনতা ও মনুষ্যকে পাপে প্রবৃত্ত করে। মনুষ্য জানে যে এই এই কার্য্য করিলে তার শরীর মন আত্মা তিনই বিকৃত হইবে, তবুও সে যেন কি একটা অন্তরস্থ টানের বশীভূত হইয়া সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া অসুখী হয়। স্রোতে যেমন তৃণ ভাসিয়া যায়, সেও তেমনি প্রবৃত্তি-স্রোতে অনন্যগতি হইয়া চলিয়া যায়। প্রাণ-গত চেষ্টা দ্বারা স্রোতের প্রতিকূলে যাইতে শিক্ষা করিতে হইবে। তপস্যা বা কঠিন চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিস্ এক সময়ে তোতলা ছিলেন। পাথরের নুড়ি মুখে রাখিয়া তিনি প্রথমে স্পষ্ট কথা কহিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। পরে সেই ব্যক্তিই আর এক সময়ে অনর্গল বক্তৃতা করিয়া গ্রীক জাতিকে আশ্চর্য্য ও বিস্ময়রসে প্লাবিত করিয়াছিলেন। শারীরিক দুর্ব্বলতার ন্যায় মানসিক দুর্ব্বলতা পরিহার করা কঠিন হইলেও অসাধ্য নহে। যদি প্রাণগত চেষ্টা আর প্রার্থনা থাকে, তবে মনুষ্য ঈশ্বরপ্রসাদে কেন না মানসিক দুর্ব্বলতা হইতে পরিত্রাণ পাইবে?

তৃতীয় আর এক পদার্থ যাহা মনুষ্যকে বিবিধ পাপে নিমগ্ন করে। মানুষ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে তাহার মনে সহস্র রূপ দুর্ব্বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে, লোকশূন্য গৃহে ভূতে বাসা করে। অন্ততঃ একথার ভিতরে একটি গূঢ় উপদেশ পাওয়া যায়। অর্থাৎ অলস ব্যক্তির মনে অনুক্ষণই কুচিন্তারূপ ভূত বাস করিয়া থাকে। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীকে তাহার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয়।

যে চাবী সর্ব্বদা ব্যবহার করা যায়, তাহা কেমন পরিষ্কার থাকে। আর যাহা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে তাহা কেমন মলিন। তেমনি যে শরীর যে মন খাটে না, সে তেমনি মলিন ও অপ্রফুল্ল থাকে। বংশে যেমন ঘুণ ধরিয়া তাহাকে নষ্ট করে, আলস্য মনুষ্যকে তেমনি একবারে অপদার্থ করিয়া ফেলে। সহস্র পাপরূপ মহাব্যাধি আসিয়া তাহার শরীর মনকে বিকৃত করিয়া তুলে।

অনেক জ্ঞানী ও ধনী লোক পৃথিবীতে বাস করেন। তাঁহারা যদি আলস্য পরায়ণ হইয়া অজ্ঞান ও দীন ব্যক্তিদিগকে ধন ও বিদ্যা দান না করেন তবে ভাবিয়া দেখ তাহাতে পৃথিবীর কত দুঃখ দারিদ্র্য বৃদ্ধি না পাইবে? অতএব বলপূর্ব্বক আমরা যেন আলস্যকে শরীর ও মন হইতে দূর করিয়া দিয়া আনন্দিত হইতে পারি।

পরিশেষে দুষ্ট স্বভাবের কথা বলিতেছি। এই দুষ্ট স্বভাব, নৈসর্গিক বা উপার্জ্জিত দুই হইতে পারে। কোন মনুষ্য দুষ্ট স্বভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, কেহ বা সংসর্গদোষে দুষ্টস্বভাব হইয়া উঠে। এই দুষ্ট স্বভাব হইতে পৃথিবীতে বহুতর উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। দুষ্টস্বভাব ব্যক্তি বন্ধুবিচ্ছেদ ও দাম্পত্য প্রেমের বিঘ্ন পৃথিবীতে সহস্রবার ঘটাইয়াছে। পৃথিবীর অনেক প্রকৃত ঘটনা দেখিয়াই সেক্‌সপিয়ার, ওথেলো ও ডেস্‌ডিমনার মধ্যে ইয়াগোর অবতারণা করিয়া ছিলেন।

দুষ্ট স্বভাব রাবণ ও মারীচের অকার্য্য বশতই লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। দুষ্ট স্বভাব লোকের ঘৃণাবিজৃম্ভিত কথাতেই সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশ হইয়াছিল। দুষ্টস্বভাব মন্থরার মন্ত্রণা প্রভাবেই রামের বনবাস হইল। দুষ্টস্বভাব শকুনির মন্ত্রণা প্রভাবেই পাণ্ডবদিগের দুর্গতি ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। দুষ্টস্বভাব কত মন্ত্রী, কত প্রজা, কত পুত্র, কত ভ্রাতা ষড়যন্ত্র করিয়া কত শত রাজাকে তাঁহাদের ন্যায়প্রাপ্ত রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছে। দুষ্টস্বভাব কত ব্যক্তি অকারণ পরনিন্দা করিয়া কত লোকের কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছে। ধন ও প্রাণ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের সুনাম নষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃতই দরিদ্র করিয়াছে। কত গৃহে কত দেশে অগ্নি লাগাইয়া কত লোকের ধন প্রাণ নষ্ট করিয়াছে। এ হেন দুষ্ট স্বভাব, নৈসর্গিক হউক আর উপার্জ্জিতই হউক, তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করাই শ্রেয়। যে মনুষ্য আপনাকে আপনি সংশোধন করিতে ইচ্ছা করে, সে যদি আপনাতে দুষ্ট স্বভাবের বীজ মাত্রও দেখিতে পায়, সে যেন সেই দণ্ডেই ঐ বীজকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। অসুরেরা সময়েই বল পায়, সে অসুরকে কখনই বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। আমরা মনুষ্য, স্বভাবতই দুর্ব্বল। আমাদের মধ্যে যাঁহারা ঋষি তাঁহারাও সময়ে সময়ে অত্যন্ত অনুতাপের জ্বালা সহ্য করিয়া থাকেন। ঈশ্বরই কেবল "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" আমরা যেন ভ্রান্তি বা অহঙ্কার বশতঃ আপনাদিগকে শুদ্ধমপাপবিদ্ধং বলিয়া মনে না করি। উপরোক্ত চারি প্রকার পাপই অধিক বা অল্প পরিমাণে আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া থাকে। এ জন্য হে পরমেশ্বর! আমরা তোমার অতি কৃপাপাত্র। আমরা তোমার নিকট কত সময়ে অপরাধী হই। তুমি আমাদের কৃত অপরাধ সকল মার্জ্জনা কর। এই তোমার নিকট প্রার্থনা।

হে দেব, এখন আমাদের মন আর সংসারের অপবিত্র কথা শুনিতেছে না। এখন তোমার কৃপায় তোমার আবির্ভাবে আমরা শুনিতেছি, তুমি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে বলিতেছ,

"আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে।
যদি ডাকে সে একবার আমায় কাতরপ্রাণে।
অহঙ্কারী পাপী যারা,
পায়না দেখা আমার তারা,
দীন জনের বন্ধু আমি, জানে সর্ব্বজনে।

হে দেব এমন বীণানিন্দিত মধুরস্বর শুনিয়াও কি আমরা পাপ-পিশাচীর আপাত-মধুর কথায় প্রতারিত হইব। এস আমরা আপন আপন মহাব্যাধিপূর্ণ হৃদয় তাঁর পদতলের নিকট লইয়া যাই—তিনি চরণামৃত সিঞ্চন করিয়া এই কঠিন রোগ

হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এস সকলে ঈশ্বরের নিকটে জ্ঞান-অসি ভিক্ষা করি, যদি হস্তে বল না থাকে, সেই দয়াময়ের নিকট হইতে বল প্রার্থনা করি, তাঁরই অসি তাঁরই বল লইয়া এস সজোরে সেই পাপরূপ বিষবৃক্ষের মূলে আঘাত করি, এখনই ইহা তাঁহার সম্মুখে শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িবে। আর আমরা, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" বলিয়া, তাঁহার পদতলে চির দিনের জন্য বিলুণ্ঠিত হইব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

জ্ঞান-শব্দের উপরে উপসর্গের প্রয়োগ।*

প্র বি এবং সং এই তিন উপসর্গের যোগে জ্ঞান-শব্দের কিরূপ অর্থান্তর ঘটে, তাহাই প্রদর্শন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমরা দেখিতেছি যে,

প্র-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ সম্মুখ-প্রবণতা।

বি-উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ পার্শ্ব-প্রবণতা।

সং উপসর্গের পরিচয়-লক্ষণ কেন্দ্রাভিমুখিতা।

জ্ঞান-শব্দের উপর ঐ তিন অর্থে ঐ তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া দেখিলেই যাহা বলিলাম তাহার যাথার্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ শাস্ত্রানুসারে প্রজ্ঞাতব্য বিবেক। সম্মুখবর্ত্তী জ্ঞাতব্য বিষয়কে আশপাশের সমস্ত ডালপালা হইতে বিবিক্ত করিয়া জানা=খোসা ছাড়াইয়া শাঁস গ্রহণ করা=প্রজ্ঞা। গণিত জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান—সমগ্র জ্ঞানবৃক্ষের বিশেষ বিশেষ শাখা প্রশাখা; এইজন্য সমগ্র জ্ঞানের তুলনায় বলা যাইতে পারে যে,

বিজ্ঞান=বিশেষ বিশেষ শাখায় পরিসমাপ্ত বিশিষ্ট রূপ জ্ঞান=Science

প্রজ্ঞা করে কি? না, নানা বিজ্ঞান-প্রবাহিণীর সাগরসঙ্গম হইতে সার মন্থন করিয়া মনুষ্যের পরমপুরুষার্থ এবং জগতের চরম উদ্দেশ্য বিষয়ে যথা-সম্ভব তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করে; এই জন্য বলা যাইতে পারে যে

প্রজ্ঞা=ফলজ্ঞান=Wisdom

এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে প্রজ্ঞা অগ্রে কি বিজ্ঞান অগ্রে? ফলজ্ঞান অগ্রে কি শাখাজ্ঞান অগ্রে? ইহার উত্তর এই যে এক হিসাবে ফল অগ্রে, আর এক হিসাবে শাখা অগ্রে। ফল হইতে বীজ, বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে শাখা বাহির হয় সুতরাং ফল অগ্রে। আবার শাখা হইতে বৃন্ত, বৃন্ত হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল বাহির হয়, সুতরাং শাখা অগ্রে। অতএব ভাবিয়া দেখিলে প্রজ্ঞা বিজ্ঞানের মূলও বটে—ফলও বটে; তাহার সাক্ষী—বেকন্ এবং দে-কর্ত্তার প্রজ্ঞা-বাণীগুলি আরিস্ততেলিক এবং আরবিক বিজ্ঞানের ফল, কিন্তু নিউটনিক বিজ্ঞানের মূল। তেমনি বেদোপনিষদের প্রজ্ঞা-বাণী গুলি প্রাচীনতর বিজ্ঞানালোচনার ফল এবং ভারতবর্ষের মধ্যমাব্দীয় বিজ্ঞানের মূল। লোকসমাজে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকে; তাহার পরে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা করে; তাহার পরে শিক্ষিত বিজ্ঞানকে সংসারক্ষেত্রে খাটাইয়া বহুদর্শিতা-সূত্রে প্রাজ্ঞ

* সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

হইয়া উঠে। যাঁহারা বিদ্বান্ মাত্র, তাঁহারা নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক এবং শাস্ত্রের উদাহরণ দ্বারা স্ব স্ব অভিপ্রেত মত সমর্থন করেন; কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্র এবং যুক্তির ক্বাথ বাহির করিয়া লইয়া এবং তাহার সিটি পার্শ্বে নিক্ষেপ করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি করেন। আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বপুরুষেরা প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত; আর অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে তাহা বুঝাইবার জন্য অনন্ত নামক একটা বৃহৎ সর্পের কল্পনা করিয়াছিলেন। "পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত" এ কথাটি শুনিতে খুব সহজ; কিন্তু প্রথমে ঐ কথাটি যাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, তিনি তাঁহার তৎকালোচিত বহুদর্শিতায় নিউটন অপেক্ষা যে, কোন অংশে ন্যূন ছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। নিউটন বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিলেন যে পৃথিবী ভারাকর্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁহার এই আবিষ্কৃত তত্ত্বটির তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের প্রজ্ঞাবাণীর তুলনায় তাহা শিশুর অর্দ্ধস্ফুট বচনের ন্যায় অসম্পূর্ণ—যদিচ বিজ্ঞান অংশে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেননা "পৃথিবী সূর্য্যের আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত" বলিলে তাহার পরেই আইসে যে সূর্য্য কিসের আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত"; যদি বল যে সূর্য্য সূর্য্যান্তরের আকর্ষণের "উপর প্রতিষ্ঠিত" তবে তাহার পরেই আইসে যে "সূর্য্যান্তর কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত" যদি বল যে, "সূর্য্যান্তর অবশিষ্ট জগতের আকর্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত" তবে তাহার পরেই আইসে যে "অবশিষ্ট জগৎ কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত"; যদি বল যে, "অবশিষ্ট জগৎ স্বপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ আপনার উপরে আপনি প্রতিষ্ঠিত"—তাহা বলিতে পার না; কেননা যদি জড় জগতের বড়ই হউক আর ছোটই হউক্ কোন একটি অংশ স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে, তবে পৃথিবী কি দোষ করিল? পৃথিবী স্বপ্রতিষ্ঠিত না হয় কেন? তা সুধু নয়—পৃথিবীর প্রত্যেক পরমাণুই স্বপ্রতিষ্ঠ না হয় কেন? "প্রত্যেক জড় বস্তু এবং জড়-বস্তু-সঙ্ঘ অন্যের আকর্ষণে বিধৃত" এই না তোমার প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত? তবে আর তুমি কিরূপে বলিবে যে, জগতের অমুক অংশ স্বপ্রতিষ্ঠ! প্রজ্ঞা কিন্তু আশপাশে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া একেবারেই নির্ঘাত বলিয়া দিলেন যে, পৃথিবী অনন্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত—ইহার উপরে আর কাহারও কোন কথা চলিতে পারে না। কেহ যেন ভুল না বোঝেন—এরূপ না মনে করেন যে, যাহা ধরিতে ছুঁতে পাওয়া যায় না, এইরূপ ঐকান্তিক তত্ত্ব লইয়া—অর্থাৎ একটা ঋজু রেখার দুই অন্ত নাই কেবল এক অন্ত আছে এইরূপ ঐকদেশিক (Abstract) তত্ত্ব লইয়া—প্রজ্ঞার যত কিছু বাণিজ্য ব্যবসায়। প্রজ্ঞার নিগূঢ় তত্ত্ব-সকল তোমার আমার চক্ষে ঐকান্তিক বা ঐকদেশিক ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না—ইহা সত্য; কিন্তু এটাও তেমনি সত্য যে, যাঁহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু পরিস্ফুট হইয়াছে, তাঁহারা জ্ঞান-দূরবীক্ষণের একান্ত এবং অপরান্ত উভয় অন্ত সমসূত্রে মিলাইয়া তাহার মধ্য দিয়া অনন্তের প্রতি পরিষ্কার সম্মুখ-দৃষ্টি প্রসারণ করেন; আর তাঁহাদের সেই নিবাত-নিষ্কম্প প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাঁহারা যাহা অবলোকন করেন, তাহা সমীচীন সত্য বই আর কিছুই হইতে

পারে না। অনন্তের প্রতি তুমি আড় দৃষ্টি প্রয়োগ করিতেছ—কাজেই তোমার অনন্ত একটা ঐকান্তিক অর্থাৎ (Abstract) আবছায়া মাত্র; কিন্তু আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আচার্য্য-মণ্ডলী যাঁহারা নিখিল জগৎ সংসার পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়া অনন্তের প্রতি সম্মুখ-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনন্তও কি তোমার আমার অনন্তের ন্যায় অপদার্থ এবং শূন্য একান্ত মাত্র, Abstraction মাত্র, তাহা হইতেই পারে না। তাঁহাদের দুই একটি কথার আভাসে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের অনন্ত অখণ্ড এবং পরিপূর্ণ সত্য, আর তাহা তাঁহাদের জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ বিরাজমান। অতএব এটা স্থির যে, প্রজ্ঞা শব্দের আদিতে প্র, আর বিজ্ঞান-শব্দের আদিতে বি, দুই শব্দের আদিতে যে দুই উপসর্গ বসিয়াছে—ঠিক্‌ই বসিয়াছে। প্রজ্ঞা= জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষবৎ অপরোক্ষ তত্ত্বের উপলব্ধি, তাই তাহার আদিতে প্র; বিজ্ঞান=সমগ্র সত্যের আশ পাশ দিয়া পরিস্ফুটিত জ্যোতিষ রসায়ন প্রভৃতি নানা প্রকার শাখা প্রশাখা সম্বন্ধীয় বৈশেষিক জ্ঞান, তাই তাহার আদিতে বি। এখন সংজ্ঞা কাহাকে বলে তাহা দেখা যা'ক্।

প্রজ্ঞা=ফলজ্ঞান (Wisdom);
বিজ্ঞান=শাখাজ্ঞান (Science);
সংজ্ঞা=বীজজ্ঞান (Consciousness)।

বীজজ্ঞানে ফলজ্ঞান এবং শাখাজ্ঞান দুইই অপরিস্ফুট আকারে সমাহিত রহিয়াছে বা কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, আর, সেই সমাহিত ভাবটি ইঙ্গিতচ্ছলে জ্ঞাপন করিবার জন্য সংজ্ঞা শব্দের আদিতে সং উপসর্গ নিযুক্ত রহিয়াছে। সং কি? না একত্র সমাহিত অর্থাৎ এক স্থানে জড়। সংজ্ঞা কি? না একস্থানে কেন্দ্রীভূত বীজজ্ঞান। কোন্ স্থানে? না জ্ঞাতার অন্তঃকরণে। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে শাখা, শাখা হইতে ফল; তেমনি সংজ্ঞা হইতে (Censciousness হইতে) লৌকিক জ্ঞান বা বিষয়-বুদ্ধি বা Common ense, বিষয়-বুদ্ধি হইতে বিজ্ঞান বা Science, বিজ্ঞান হইতে প্রজ্ঞা বা Wisdom। Consciousness হ'চ্চে বীজ, বিষয়-বুদ্ধি হ'চ্চে অঙ্কুর, বিজ্ঞান হ'চ্চে ডালপালা, প্রজ্ঞা হচ্চে ফল। ধান্য যখন মাটির ভিতরে থাকে তখন তাহা বীজ; যখন তাহা শীষের আগায় বিরাজ করে, তখন তাহা শস্য। এক গাছের শস্য যেমন আর এক গাছের বীজ হইতে পারে, তেমনি এককালের প্রজ্ঞা আর এককালের সংজ্ঞা হইতে পারে; তাহার সাক্ষী—বেদোপনিষদ্ মহাভারত রামায়ণ বাইবেল এবং সেক্সপিয়রের প্রজ্ঞাবাণী এক্ষণে জনসাধারণের সংজ্ঞার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে—অর্থাৎ এইরূপ হইয়াছে যেন সে-সকল মহাবাক্য জন্মাবধি সকলেরই অন্তঃকরণে বদ্ধমূল। সং এবং আধান এই দুয়ের যোগে সমাধান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সমাধি কি? না একত্র সমাধান—একত্র সমাবেশ—সমস্ত মনোবৃত্তি একস্থানে জড় করা। "বাণ সন্ধান করা হইতেছে" বলিলে বুঝায়—সমস্ত মনোবৃত্তি বাণের সহিত একযোগে লক্ষ্যের প্রতি কেন্দ্রীভূত করা হইতেছে। সং উপসর্গ সংজ্ঞা শব্দের আদিতে বসিয়া ইঙ্গিতচ্ছলে জ্ঞাপন করিতেছে যে, জ্ঞানের সমস্ত ভাবী শাখা প্রশাখা এবং ফলফুল শিশুর সংজ্ঞার ভিতরে জড়িপুঁটুলি হইয়া রহিয়াছে; সংজ্ঞারূপী মুকু-

লের অভ্যন্তরে তাহার আশপাশের পাপড়ি—বিজ্ঞান, এবং সম্মুখের বীজ-কোষ প্রজ্ঞা, দুইই কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে।

রামাবতারের অভিব্যক্তি।

উত্তরকাণ্ড।

যুদ্ধকাণ্ডের উপসংহার ভাগে আছে যে রাম রাজা হইয়া ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। তাঁহার রাজত্ব কালের পরিমাণ দশ সহস্র বৎসর। তিনি পুত্র ভ্রাতা ও বান্ধবগণের সহিত অনেকবার নানাবিধ যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে কাহারও বৈধব্য ঘটে নাই, হিংস্র জন্তুর উপদ্রব প্রশমিত হইয়াছিল, ব্যাধি ভয়ের নাম গন্ধও ছিল না। প্রজারা সকলেই হৃষ্ট ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল, লোক সকল সহস্রবর্ষজীবী ও বহুপুত্রে পরিবৃত ছিল। এইখানেই যুদ্ধকাণ্ড পরিসমাপ্ত। ইহার পরে এবং উত্তরকাণ্ড আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে রামায়ণ পাঠের ফলশ্রুতি এই মহাকাব্যে স্থান পাইয়াছে। অবশ্য তাহা অপরের রচনা। ফলশ্রুতিতে এইমাত্র আছে যে এই প্রাচীন কাব্য মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। ইহা বেদমূলক ও রাজগণের বিজয়প্রদ। এই রামাভিষেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পুত্রার্থী পুত্র ও ধনার্থী ধন লাভ করেন। এই রামায়ণের প্রসাদে আয়ু আরোগ্য যশ বুদ্ধি বল ও সৌভ্রাত্র লাভ হয়। অতএব যাঁহারা সম্পদলাভার্থী তাঁহারা নিয়ম পূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবেন। ইত্যাদি

আমরা পূর্ব্ব এক প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে রামায়ণের ভিতরে সহস্র শব্দ বহুবাচীমাত্র। এই সহস্র শব্দের নিজের কোন সার্থকতা নাই। আমরা যতটুকু বুঝি তাহাতে দশ সহস্র বৎসর যাহা রামের শাসনকাল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে তাহা দশ বৎসর হওয়াই সম্ভব। অন্ততঃ তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞের পরিমাণ যখন দশবার, তখন তাঁহার রাজত্বের প্রতিবৎসর একবার করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ হইত, ইহাই যেন সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণেই যখন আবার প্রজাগণের আয়ুষ্কাল সহস্র বৎসর বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন রামের নিরবচ্ছিন্ন রাজত্বকালের পরিমাণ দশ সহস্র বৎসর থাকা নিতান্তই অস্বাভাবিক। রামের প্রজাগণ সুস্থ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন, ইহাই বলা মহাকবির উদ্দেশ্য ছিল। সমগ্র রামায়ণের মধ্যে যেখানে যেখানে সহস্র শব্দ আছে পাঠকগণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন আমাদের প্রস্তাবিত অর্থের সহিত তাহা একবার মিলাইয়া দেখেন। রামচন্দ্র পুত্র মিত্র লইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ইহার পরে রামের রাজত্বকাল কবে পরিসমাপ্ত হইল, তাহা জানিবার জন্যই লোকের ঔৎসুক্য থাকিতে পারে। কিন্তু উত্তরকাণ্ড কতকগুলি অসম্ভব অসম্বদ্ধ পৌরাণিক উপাখ্যান লইয়া অবতীর্ণ।

রামচন্দ্র নির্ব্বিবাদে রাজ্যশাসন করিতেছেন, অকস্মাৎ একদা কৌশিকাদি অগ্নিকল্প কয়েকজন মহর্ষি অভিনন্দন করিতে রাজসভায় সমাগত। পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহান্তে তাঁহারা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাবণকে যে বিনাশ করিয়াছ ইহা তোমার পক্ষে সামান্য কথা; কিন্তু কালস্রোতের ন্যায় ধাবমান ইন্দ্রজিতের যে বধসাধন করিয়াছ এইটিই আমাদের পরম ভাগ্য। রাম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন আপনারা

কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে ছাড়িয়া ইন্দ্রজিতের কেন এত প্রশংসা করিতেছেন। মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন অগ্রে রাবণের কুল জন্ম ও বরপ্রাপ্তির বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক, পরে ইন্দ্রজিতের কথা বলিব। এই বলিয়া তিনি কাহিনী আরম্ভ করিয়া দিলেন। সে কাহিনীর আর বিরাম নাই। উত্তরকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গ হইতে ৩৭ সর্গ উহাতেই পূর্ণ।

কবি যে যে ঘটনাবলী স্বীয় অলৌকিক প্রতিভাবলে একবার চিত্রিত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে এমন কেহ নাই যে তাহার উপর আবার তুলিকা চালনা করিতে পারে। কিন্তু উত্তরকাণ্ডের এই অংশ ঠিক তাহার বিপরীত। উত্তররামচরিতের সীতানির্ব্বাসন পাঠে দরদর ধারে কাহার না অশ্রুবিগলিত হয়। তাহার ছায়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসও মর্ম্মদেশ নিস্পেশিত করিয়া বাল্যে কতই না অশ্রুধারা নিপাতিত করিয়াছে, শিক্ষক ও পণ্ডিতমহাশয়গণের নিকট আত্মগোপনের জন্য কতই না আমরা প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু বাল্মীকির উপরে আরোপিত এই উত্তরকাণ্ডের ভিতরে সেরূপ কিছুই নাই।

৫০ সর্গে সুমন্ত্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন রাজকুমার! আপনি উন্মনা হইবেন না। রাম যে চিরদুঃখী হইবেন, ব্রাহ্মণেরা তাহা পূর্ব্ব হইতেই তোমার পিতার নিকটে বলিয়াছিলেন। এমন কি রাম তোমাকে ভরত শত্রুঘ্নকেও বহুকালের জন্য পরিত্যাগ করিবেন। আমি তোমাকে যাহা বলিলাম ইহা কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। রাজা দশরথ এ সমস্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। তুমি শোক পরিত্যাগ কর, দৈব যারপর নাই দুর্ব্বোধ। (উত্তরকাণ্ডের এই অংশে পরবর্ত্তী ঘটনার আভাস দেওয়ায় আবার রসভঙ্গ দোষ বর্ত্তিল। মহাকবির হস্তে এরূপ অমার্জ্জনীয়-দোষ আদৌ ঘটিতে পারে না)।

লক্ষ্মণ সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে সুমন্ত্র ৫১ সর্গে বলিতেছেন, যে সুরাসুর সংগ্রামে দৈত্যেরা দেবগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া ভৃগুপত্নীর শরণাপন্ন হয়েন। সুরপতি বিষ্ণু এই ব্যাপারে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ চক্রে ভৃগুপত্নীর মস্তক ছেদন করেন। মহর্ষি ভৃগু পত্নীকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে বিষ্ণুকে অভিসম্পাত করিলেন এবং বলিলেন তুমি যেমন আমার অবধ্য পত্নীকে বধ করিয়াছ, মনুষ্যলোকে তোমার জন্ম হইবে এবং ব্যাপক কাল ধরিয়া তুমি স্ত্রীবিয়োগ দুঃখ ভোগ করিবে। ভগবান বিষ্ণুই এক্ষণে ত্রিলোকে রাম নামে খ্যাত। (রামাবতার সম্বন্ধে অন্যান্য পুরাণের সহিত এই স্থলের বৈলক্ষণ্য পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন।)

৫২ সর্গে লক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিতেছেন। ৫৩ সর্গ হইতে আবার অসম্বদ্ধ পৌরাণিক আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। রাজকার্য্যে অবহেলা নিবন্ধন রাজা নৃপের অভিশাপ বৃত্তান্ত রাম বলিতেছেন, আর লক্ষ্মণ তাহা শ্রবণ করিতেছেন। ৫৪ সর্গে নৃপের বৃত্তান্ত শেষ হইল। ৫৫ সর্গে রাম লক্ষ্মণকে বলিতেছেন যে যদি তোমার এরূপ আখ্যায়িকা আরও শুনিবার ইচ্ছা থাকে, কহিতেছি শুন এই বলিয়া বশিষ্ট ও রাজা নিমির উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন। ৫৯ সর্গে গল্পপ্রসঙ্গে জরাগ্রস্ত রাজা যযাতির কথা উঠিল।

পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন যে বিশুদ্ধ পুঁথি অবলম্বনে রামায়ণ প্রকাশ করেন, তাঁহারই স্বীকৃত মতে ৩৭ ও ৩৮ সর্গের মধ্যে ৫টি সর্গ, ও ৫৯ ও ৬০ সর্গের মধ্যে ৩টি সর্গ প্রক্ষিপ্ত। সুতরাং তৎসমুদায়ের সমালোচনা নিরর্থক।

৬০ সর্গে তাপস চ্যবন আসিয়া রামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং ৬১ সর্গে কহিলেন, মধুনামা দৈত্য-পুত্র লবণ আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। ৬২ সর্গে শত্রুঘ্ন লবণ বধ করিতে চাহিলে, ৬৩ ও ৬৪ সর্গে রাম তাঁহাকে লবণবধের উপায় বলিয়া দিলেন। ৬৫ ও ৬৬ সর্গে শত্রুঘ্ন যুদ্ধযাত্রা করিলেন এবং বাল্মীকির তপোবনে একরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। ঐ রাত্রিতে লব কুশের জন্ম হয়। ৬৯ সর্গে লবণ শত্রুঘ্নহস্তে নিহত হইল। ৭০ সর্গে রামের নির্দ্দেশ মতে মধুপুরী শত্রুঘ্নের রাজধানী নিরূপিত হইল। ব্যাপক কাল ধরিয়া তথায় থাকিয়া শত্রুঘ্ন অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং ৭।৮টি পান্থনিবাস অতিক্রম করিয়া ৭১ সর্গে বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি রামচরিত রচনা করিয়াছিলেন; ভোজনান্তে শত্রুঘ্নকে তাহা শ্রবণ করাইলেন। যদিও ঘটনাগুলি পূর্ব্বের, তথাপি তৎসমুদয় প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত হইতে লাগিল। সৈনিকেরা বলিতে লাগিল, একি! আমরা কোথায়! ইহা কি স্বপ্ন! আমরা পূর্ব্বে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এই আশ্রমপদে তাহাই শুনিলাম!

শত্রুঘ্ন আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া রামের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামও সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি রাজা হইয়াছ, প্রবাসে কালক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি সাত রাত্রি এখানে থাকিয়া স্বনগরে প্রতি নিবৃত্ত হইও। শত্রুঘ্ন তাহাই করিলেন।

৭৩ সর্গে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি মৃত বালককে লইয়া রাজদ্বারে আসিয়া কহিল, রামের রাজ্যে অকাল মৃত্যু ছিল না, কিন্তু যখন এই বালকের মৃত্যু ঘটিল, তখন অবশ্যই রাজার কোন পাপ আছে। রাম ব্রাহ্মণের সেই সকরুণ বাক্য শুনিয়া সভাসদগণকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসিলে, নারদ কহিলেন, সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিত, অকাল মৃত্যু কাহাকেও স্পর্শ করিত না। সত্যের পর ত্রেতাযুগ। এই সময়ে মনুষ্যের আত্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায়; তন্নিবন্ধন দেহে আত্মাভিজ্ঞান এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম। সত্যযুগে তপস্যায় কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার ছিল, ত্রেতায় তাহা ক্ষত্রিয়-সাধারণ হইল। ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব এবং যাগাদি কর্ম্মের অবতারণা হেতু পাদমাত্রে অধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল। সত্যে অপ্রযত্নোপলব্ধ ফলমূলমাত্র লোকের আহার ছিল, অধর্ম্মের এই (অনৃত) কৃষিরূপ এক পদে পৃথিবীর অবস্থান নিবন্ধন লোকের আয়ু সত্যযুগ অপেক্ষা হ্রাস হইয়া আসিল। দ্বাপরে তপস্যা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে অধিকার করিল। কিন্তু শূদ্রের তাহাতে অধিকার হয় নাই, কলিযুগই তাহার প্রকৃত সময়। সেই শূদ্র আজি তোমার রাজ্যে তপস্যা করিতেছে, তাই এই বিপ্রবালক অকালে কালগ্রাসে নিপতিত।

তচ্ছ্রবণে রাম সেই ব্রাহ্মণকে আশ্বাস দিয়া ইতস্তত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ৬৮ সর্গে রাম দেখিলেন; শম্বূক নামক জনৈক শূদ্র দেবত্ব-লাভের জন্য কঠোর

তপস্যা করিতেছে। রাম তাহার পরিচয় লইয়া অবিলম্বে তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। সুরগণ প্রীত হইলেন; ব্রাহ্মণকুমারও সেই মুহূর্ত্তে জীবিত হইল।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, উপরে যে শম্বূকের উপাখ্যান প্রদত্ত হইল তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ যুগের চিত্র? এই সময়ে শুদ্ধ যে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণের অনন্যসাধারণ তপশ্চর্য্যা অধিকার করিয়াছিল এমন নহে, বৈশ্যজাতিও ক্ষত্রিয়গণের পদানুসরণ করিয়াছিল। কেবল শূদ্রেরাই তাহা হইতে বঞ্চিত ছিল। যখনই তাহারা আপনাদিগের আশা ও অধিকারকে উন্নত ও প্রশস্ত করিতে চেষ্টা পাইত, অমনি ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণের সাহায্যে তাহাদিগকে দমন করিতেন। আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণের অপর কয়েক কাণ্ডে সামাজিক অবস্থার যে ছায়া দিয়াছেন, তাহার সহিত উত্তরকাণ্ডের রচনার আদৌ কোন সামঞ্জস্য নাই। তাই বলিতেছিলাম উত্তরকাণ্ড নিতান্ত আধুনিক এবং উহা নিম্নশ্রেণীর কোন লেখকের মানস পুত্রমাত্র। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে উপরে ব্রাহ্মণাদি চারিজাতির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে একটু বেশ নবীনত্ব আছে।

পুরাকালের বিবাহ।

গত প্রকাশিতের পর।

বুদ্ধদেব স্ত্রীনির্ব্বাচন প্রসঙ্গে যে সমস্ত দোষগুণের উল্লেখ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে দেখা যায় এই প্রাচীন ভারতে সম্ভ্রান্ত গৃহের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মদ্যের সামান্য প্রচলন ছিল তাই তিনি কহিয়াছিলেন, যে স্ত্রী পানাসক্ত নয়, পাণিগ্রহণের জন্য তাহাকেই মনোনীত করিবে। স্ত্রীলোকের পানাসক্তি সকল দেশের পক্ষেই একটী দুরপনেয় কলঙ্ক। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও দেখা যায় সীতা দ্রৌপদীরও সামান্য পানদোষ ছিল। মনু প্রভৃতি সংহিতাকারেরাও স্ত্রীজাতির এই দোষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই গুলি পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় অতি প্রাচীন কালে সর্ব্বাঙ্গীণ যা কিছু উৎকর্ষ থাকুক না, এই দোষও সমাজের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এই দোষ যে কেবল ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে দৃষ্ট হইত তাহা নহে, এক সময়ে ইহা ব্রাহ্মণের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা না হইলে শুক্রাচার্য্য ব্রাহ্মণের মদ্যপান কেন নিষেধ করিয়া যান। পরবর্ত্তী বিবিধ কাব্য গ্রন্থে এই পানপ্রসক্তির অনেক উদাহরণ আছে, কিন্তু তাহা কবির কল্পনাপ্রসূত বলিয়া উপেক্ষা করিলেও পূর্ব্বতন সংহিতা ও পুরাণাদি গ্রন্থে যখন ইহার উল্লেখ দেখা যায় তখন ইহা যে অন্ততঃ সমাজের নিম্ন স্তরে প্রসার লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যখন সমাজ মধ্যে ধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, ধর্ম্মের নামে নানারূপ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে থাকে, সেই সময়ে কোনও মহাত্মা করুণাপরতন্ত্র হইয়া জনসমাজকে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং যে কোন উপায়ে হউক আবার ধর্ম্ম ও নীতির প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময়ে যে কুরুক্ষেত্রে রক্তনদী বহিয়াছিল, তাহার সূত্র আর কিছুই নয় কেবল ধর্ম্ম-প্রতিরোধ। শিশুপাল কংস জরাসন্ধ প্রভৃতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজারা অধর্ম্ম-প্রবর্ত্তিত হইয়া যেরূপ অত্যাচার করিত তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কেবল গৃহবিবাদ-সমুত্থিত নয়, কিন্তু এই গৃহবিবাদ উপলক্ষ্য করিয়া দুষ্টদমন ও ধর্ম্মস্থাপন করাই বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ফলে ঘটিয়াছিলও তাহাই। ঐ যুদ্ধে কৃষ্ণ যে সমস্ত মহান্ বাক্যে অর্জ্জুনকে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থাপিত করেন সেই ভগবদ্গীতা আজও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যখন বুদ্ধের জন্ম হয় তখনও সমাজে ধর্ম্ম অবসন্ন। যে সময়ে অপরিণীতা কুমারীর ও পানদোষের কলঙ্ক ছিল, তখন সমাজের অবস্থা কি পর্য্যন্ত দূষিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা

যায়। এতদ্ব্যতীত যাগযজ্ঞে পশুহত্যা প্রভৃতি নানা রূপ অনর্থকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। বুদ্ধদেব ধর্ম্ম ও নীতিগত এই সমস্ত দোষ নির্ম্মূল করিবার জন্য উত্থিত হন। কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন বাসনা এককালে নির্ম্মূল করিতে না পারিলে দোষের হস্ত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। তিনি সন্ন্যাস প্রবর্ত্তনা করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাস মনুষ্যপ্রকৃতিবিরুদ্ধ। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত মনোবৃত্তি দিয়াছেন, সন্ন্যাসে তাহার যথাযথ চরিতার্থতা সাধিত হইতে পারে না। সুতরাং এই সন্ন্যাসই ভবিষ্যতে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাতক হইয়া দাঁড়ায় এবং জনসমাজের মধ্যে যে সমস্ত দোষের প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহা অব্যাহত থাকে। পরে বৌদ্ধ দণ্ডী ও মুণ্ডীরাই তান্ত্রিক হইয়া ঐ সকল দোষের বিশেষ স্ত্রীবৃদ্ধি করেন। বহু শতাব্দী পরে আবার এই সকল দোষ দূর করিবার জন্য ভাগবত গ্রন্থ রচিত হয় এবং এই ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য চৈতন্য দেব উত্থিত হন। কিন্তু তিনিও সশিষ্য সন্ন্যাসী। দুঃখের বিষয় কেবল বহুবর্ষব্যাপী অন্ধভক্তিস্রোত ব্যতীত তিনি পশ্চাতে বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। জনসমাজ আবার পূর্ব্বাবস্থই থাকিয়া যায়। তাঁহার বহুকাল পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইহা সমাজগত সমস্ত পাপান্ধকারের একমাত্র প্রদীপ্ত সূর্য্য। ইহার বীজমন্ত্র 'ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ' ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহী হইবেন। বুদ্ধ ও চৈতন্য যে ব্যতিক্রমে জনসমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই, বহুকাল পরে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রসাদাৎ তাহা সংঘটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন ব্রাহ্মসমাজের শৈশবাবস্থা, এখন ইহা লইয়া বিশেষ কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না বটে কিন্তু ইহার মত ও বিশ্বাস যেরূপ মনুষ্যপ্রকৃতির উপযোগী তাহাতে আশা করা যায় যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারকেরা যাহা করিতে পারেন নাই ইহা দ্বারা তাহা সাধিত হইবে। এখন সুশিক্ষিত ভদ্র গৃহস্থের মধ্যে পানদোষ নাই বলিলেই হয় ইহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। এবং আজকাল বিবাহের পাত্রী নির্ব্বাচন করিতে গিয়া তাহার পানদোষ আছে কি না সে অনুসন্ধানও আর করিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু কিছু কাল পূর্ব্বে তান্ত্রিকদিগের অত্যাচারে স্ত্রীলোকের মধ্যে এই দোষ যে কিয়ৎ পরিমাণে ছিল আজও তাহার কিছু কিছু নিদর্শন আছে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ চৈত্র মঙ্গলবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭৷৷ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ বুধবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বর্ষশেষ হইতে চলিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল হিঃ যাঁহাদিগের নিকট ১৮১৯ শক পর্য্যন্ত টাকা অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা শীঘ্র টাকা দিয়া সমাজকে উপকৃত ও বাধিত করিবেন। সকলেই জানেন যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দেয়। তাহাতে এত দীর্ঘ কাল টাকা অনাদায় থাকিলে সমাজকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস।
সহকারী সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৮, মাঘ মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৯৮৶৯
পূর্ব্বকারস্থিত	...	১৮২৯৸০
সমষ্টি	...	২২২৭৸৶৯
ব্যয়	..	৪২৮৷ ৬
স্থিত	...	১৭৯৯৷৷৶৩

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	৫০০৲
দফে উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত এক কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ	১০০০৲
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সোলা পোষ্ট বিল এক কেতা	১৩৮৵৩
শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত	১১৬৷৷৶৯
	১৭৫৪৸৶৩
	১৭৫৪৸৵০
হাওলাত শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু	৭৲
সমাজের ক্যাশে মজুত	৩৭৸৩
	১৭৯৯৷৷৶৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	... ..	২১২৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲
শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন ধর	২৲
„ „ গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র চৌধুরী	২৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	২৲
	২১২৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৯৶০
৺ বাবু জয়গোপাল সেন, কলিকাতা		১৲
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ঐ		২৲
„ রাজা কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র বাহাদুর, মেদিনীপুর		৩৲
„ বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন, ডিব্রুগড়		৩৵০
„ „ মহেন্দ্রনাথ পাল, বরানগর		২৲
„ „ রামচন্দ্র মৌলিক, বেনারস		৩৵০
„ সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, ঐ		৷৵০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নগদ বিক্রয়		৪৲
		১৯৶০
পুস্তকালয়	...	৩৪৷৷৵৩
যন্ত্রালয়	...	১০৭৸ ০
গচ্ছিত	...	১২৷৷৶৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন		১২৶০
সমষ্টি		৩৯৮৶৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২২৭৷ ৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৩৯ ৶০
পুস্তকালয়	...	৪০৷৵০
যন্ত্রালয়	...	১২১৷৶৯
সমষ্টি		৪২৮৷ ৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।